দেবীরক্ত

সুস্মিতা সাহা

দেবীরক্ত

সুস্মিতা সাহা



অভিযান পাবলিশার্স

সেই সমস্ত মানুষদের যাদের শৈশব সুন্দর হলে
তারা আজকে সমাজের মূলস্রোতে থাকতে পারত।

ঘড়িতে রাত বারোটা। শেষ হয়ে আসা চিকেন পকোড়ার প্লেটের পাশে রাখা গ্লাসে আরও কিছুটা রেড ওয়াইন ঢেলে গ্লাসটা বাড়িয়ে ধরল সে,— এটা লক্ষ্মীসোনার মতো চুকচুক করে খেয়ে নাও তো মামণি! খাও খাও, এই তো গুড গার্ল।

প্লেট থেকে পকোড়া মুখে চালান করে, সে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। নাহ্, ভাজা হয়ে গেলেই মাংসের স্বাদ কেমন শুকিয়ে যায়। বিচ্ছিরি হয়ে যায় একদম। ছ্যাঃ! পেছন ঘুরে দেখল, মেয়েটার মাথা একদিকে হেলে পড়েছে। যাক এখন বেশ রয়ে সয়ে খাওয়া যাবে। প্যান্টের পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। জ্বলন্ত সিগারেটের মুখে চুমু খেয়ে জানালার বাইরে তাকায় সে। বৃষ্টির জলে ধুয়ে যাওয়া ফুটপাথের ওপর ঝুঁকে থাকা সোডিয়াম লাইটটা দপদপ করে জ্বলছে। রাত ফুরোনোর আগে শেষবারের মতো দম নিচ্ছে যেন। সিগারেটটা ছাই হয়ে গেলে, ঘুরে এগিয়ে যায় মেয়েটার দিকে। ঘাড়ে সিরিঞ্জ পুশ করে খানিকটা রক্ত নিয়ে ওয়াইনের খালি গ্লাসটায় রাখে। রক্তের গন্ধ শুঁকে এক অদ্ভুত উন্মাদনা ছড়িয়ে পড়ে তার শিরায় শিরায়। মেয়েটাকে তুলে নিয়ে যায় পাশের ঘরে, — এসো মামণি শুইয়ে দিই তোমায়। রক্তদান হল জীবনদান বুঝলে, রক্ত দাও, রক্ত। এটাই তো জীবনের সার-সত্য! এই তো ব্যাগ ব্যাগ রক্ত দিতে দিতে সাদা হয়ে যাও তুমি। লক্ষ্মী মেয়ে, সোনা মেয়ে, ওলেবাবালে, গুড গার্ল! চলো রেস্ট নাও, আমি তোমার এই রক্ত ভরতি ব্যাগগুলো রেখে আসি, ওয়েট।

রান্নাঘরে গিয়ে ফ্রিজের ভেতর রক্তের ব্যাগগুলো রেখে সামনের ঘরে ফিরে এল। ওয়াইনের গ্লাসে রাখা রক্তটা এক চুমুকে খেয়ে নিল সে।

— আহ্ কী টেস্ট! যাই এবার ওকে কেটেকুটে গুছিয়ে রাখি। দেখি মামণি তোমার আঙুলগুলো দেখি...কী হবে এত নখ দিয়ে? উপড়ে দিই এসো। ইশ্‌শ্ এই চোখগুলো বেশ জীবন্ত তো! দাঁড়াও কাঁটা চামচ নিয়ে আসি, দুটো কাঁটা চামচ আঙুল পেঁচিয়ে ধরে

চিমটার মতো করে তোমার চোখগুলো কেমন কোটর থেকে বের করে নিই দ্যাখো এই... এইতো! এই ট্রে-তে রেখে দিই। ওই ছুরিটা কই... ছুরিটা... হ্যাঁ! গলা আর মাথা আলাদা করে দিই এবার... না না মাথাটা আগে একটু থেঁতলে দিই, কিউট লাগবে বেশ। বলো তো, মাথা থেঁতলে গেলে কী হয়? গড়িয়ে পড়া ঘিলুর রসে গ্রে ম্যাটার ভাসে। এই গ্রে ম্যাটার আমার আছে, তোমার আছে। না থাকলে বিপদ আছে, হিহ্হিহ্হিহ্। কুর্তিটা কোথা থেকে নিলে গো? অনলাইন? খুলে দিই দাঁড়াও। আরে এসব চামড়ার ভাঁজ কেন আবার? ড্রেসিং করে দিই, এই শুকনো চামড়া ছাড়িয়ে নিলেই তুমি মাংসের দলা। সবাই জানো সবাই মাংসের দলা। তুমি, বস্তির গীতা, সিনেমার নায়িকা সবার সেম, দলা দলা মাংস। অহংকার তো সব চামড়ার। এসো চামড়া ছাড়িয়ে তোমার মাংস কেটে দিই। তারপর আস্তে আস্তে হার্ট, লিভার, কিডনি সব আলাদা আলাদা করে রাখতে হবে তো! এই হাড় থেকে মাংস আলাদা করতে আলাদাই ফিলিংস মামণি! কী তুলতুলে, নরম নরম মাংস... ধীরে ধীরে তুমি কঙ্কাল হবে, আমার সঙ্গে থাকবে, তোমার রক্ত আমার রক্তে মিশবে...থ্যাঙ্ক ইউ সোনা। থ্যাঙ্কস্ আ লট!

১

কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের সামনে ট্যাক্সি থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে দিলেন অভিজ্ঞান। ঘুরে গেটের দিকে এগোতেই দেখেন কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে সোনালি পাড়ের সাদা শাড়ি পরিহিতা এক মধ্যবয়সি মহিলা ওর দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। মহিলাদের বয়স বুঝতে চাওয়া বোকামি, কিন্তু অভিজ্ঞান জানেন চুল কেটে ঘাড়ের ওপর তুলে দেওয়া, রিমলেস চশমার ফাঁক দিয়ে চোখে ঝিলিক দিয়ে হেসে ওঠা ওর মিষ্টি এই বন্ধু মন্দাক্রান্তার বয়স এখন পঁয়ত্রিশ পেরিয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একসঙ্গে গ্র্যাজুয়েশন শেষ করে বের হয়েছিলেন দুজনে। তারপর মন্দাক্রান্তা কলকাতায় অ্যাপ্লায়েড সাইকোলজিতে মাস্টার্স শেষ করে, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিতে এমফিল করে এতদিনে বিদ্যাসাগর কলেজের এইচওডি ড. মন্দাক্রান্তা সেন হয়েছেন। কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে ছড়িয়ে থাকা সাইকোলজির ছাত্রছাত্রীদের কাছে এখন বেশ পরিচিত নাম 'এমএসম্যাম'। মন্দাক্রান্তা এগিয়ে এলেন ওর বিলেতফেরত হ্যান্ডসাম বন্ধুটির কাছে। বয়স বাড়তে থাকলে মানুষের মুখে যে একটা অভিজ্ঞতার আলো ভেসে ওঠে তা বোঝা যায় ওর কলেজ জীবনের বন্ধু অভিকে দেখে। গ্র্যাজুয়েশনের পর ক্রিমিনাল সাইকোলজিতে মাস্টার্স শেষ করে অভি আমেরিকায় পড়তে চলে যায়। তারপর গুজরাটে প্র্যাকটিস করছিল। প্রায় নয়বছর পর ওকে সামনে থেকে দেখে কলেজ জীবনে ফিরে যাচ্ছিলেন মন্দাক্রান্তা, কিন্তু তখনই ওর চোখ যায় অভিজ্ঞানের চুলের দিকে। ব্যাকব্রাশ করা চুলে সামনের দিকে একটু পাক ধরেছে। আগের চেয়ে একটু

মুটিয়েছে, তবে পাঁচ বাই ছয়ের সুঠাম দেহে জড়িয়ে থাকা সাদা শার্ট আর নীল জিন্‌সে, তার ওপর রিমলেস চশমায় ওই পাক ধরা চুল অভির ক্ষেত্রে শাপে বরই হবে মনে হয়। আজকাল ওর ছাত্রীদের দেখছে তো, কাঁচাপাকা চুলকে ওরা বলে 'সল্ট অ্যান্ড পিপার'। তারপর নুন, গোলমরিচ মাখিয়ে ওই আচারে সব আচার-বিচার ভুলে বাবার বয়সি লোকের ওপর দুমদাম আছাড় খাচ্ছে; ওই 'ক্রাশ' খাচ্ছে আর কী। নিজের ভাবনায় নিজেই হাসি চাপেন মন্দাক্রান্তা।

অভিজ্ঞান ওর দিকে এগিয়ে এসে খুশি হয়ে বলেন, — এই কী ব্যাপার রে? আমাকে দেখে তোর হাসি পাচ্ছে, না আনন্দ হচ্ছে?

এবার সত্যিই হাসতে হাসতে মন্দাক্রান্তা বলেন, — তোকে দেখে অবশ্যই খুশি হয়েছি, তবে তোর সম্ভাব্য অবস্থার কথা ভেবে হাসি পাচ্ছে।

— কেন?

— কেন-র কারণ পরে বলব। এখন ভেতরে চল। দশ মিনিটের মধ্যে কনফারেন্স শুরু হয়ে যাবে।

দুই কলেজ জীবনের বন্ধু এখন কলেজের প্রফেসর। মন্দাক্রান্তা সেনের আমন্ত্রণে অভিজ্ঞান মুখার্জি কনফারেন্সের অন্যতম প্রধান অতিথি হয়ে সেমিনার হলে ঢুকলেন। হলটা মোটামুটি ছোটোই বলা যায়। মঞ্চে বসলেও হলের শেষপ্রান্ত অবধি স্পষ্ট দেখা যাবে। আজকের আলোচ্য বিষয়, 'আন্ডারস্ট্যান্ডিং ক্রিমিনাল বিহেভিয়ার'। অভিজ্ঞানকে নির্দিষ্ট চেয়ারে বসিয়ে দিতে যাবে এমন সময় মন্দাক্রান্তার ফোন বেজে ওঠে। ওর এক ছাত্রী ফোন করছে। ছাত্রীকে সেমিনার হলটা কোনদিকে তা বুঝিয়ে দিয়ে মন্দাক্রান্তা অভিজ্ঞানের পাশের চেয়ারে গিয়ে বসেন। সেমিনার শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে ওকে ডাকা হয় বক্তৃতা দেওয়ার জন্য। চেয়ার থেকে উঠে পোডিয়ামে গিয়ে দাঁড়ান এমএসম্যাম। অভিজ্ঞান ওর বন্ধু 'মন্দা'কে দেখছিলেন। কলেজের ফেলে আসা দিনের স্ট্রাগলের কথা ভাবছিলেন, এমন সময় ওর চোখ গেল হলে ঢোকার দরজার দিকে। দরজা দিয়ে হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়েছে দুজন তরুণ-তরুণী। তরুণীটির উচ্চতা পাঁচ বাই দুই হবে। পরনে ডেনিম জিন্‌স আর কালো গেঞ্জির ওপর সাদা-কালো চেক শার্ট, যার হাতা দুটো কনুইয়ের কাছে মুড়ে বোতাম দিয়ে আটকে রেখেছে। মাথায় একঝাঁক ঝাঁকড়া চুল। বাঙালি মেয়েদের তুলনায় একটু বেশি ফরসা, তবে চোখের কাজলে আত্মবিশ্বাস ধরা পড়ছে। এই মুহূর্তে ও ইতস্তত এদিক-ওদিক তাকিয়ে স্টেজে মন্দাক্রান্তাকে দেখে নিশ্চিন্ত হাসি হাসল। তারপর এক কাঁধে ঝোলানো ব্যাগের স্ট্র্যাপটা খামচে ধরে এগিয়ে এসে একটা ফাঁকা চেয়ারে বসে গেল। পায়ে কেডস জুতো পরে আছে বলে অভিজ্ঞান দেখতে পারছেন না ও পায়ের এক আঙুল দিয়ে আর-এক আঙুল পিষছে কিনা। তবে বসার এবং হাতের ভঙ্গি দেখে এটুকু বুঝতে পারছে ও একটু নার্ভাস হলেও নিজের

মধ্যে কনফিডেন্স ধরে রাখার চেষ্টা করছে। উজ্জ্বল দুটো চোখের চাহনি দেখলে মনে হয় মেয়েটা সারাক্ষণ যেন কিছু একটা খুঁজে চলেছে। কোনো ঘটনার কারণ, কোনো প্রশ্নের উত্তর বা অন্য কিছু। অভিজ্ঞান লক্ষ করলেন ওর সঙ্গে ঢুকে আসা তরুণটি উচ্চতায় অভিজ্ঞানের থেকে লম্বাই হবে। সদ্য তারুণ্যে প্রবেশ করা মুখে এখনও কৈশোরের সারল্য লেগে আছে। ছেলেটার খুব সম্ভবত শার্ট পরার অভ্যাস নেই। হতে পারে নেহাত সেমিনার বলে আজকে পরতে হয়েছে, কারণ বারবার ও নিজের সাদা শার্টের বোতামগুলো দেখছে। ফর্মাল প্যান্টের ওপর বেল্ট দিয়ে আটকে থাকা শার্টের ভাঁজগুলো টেনে টেনে ঠিক করছে। চোখের কালো ফ্রেমের চশমা ওর মুখে গজিয়ে ওঠা দাড়িকে আলাদা গাম্ভীর্য দিয়েছে। তবে এই পরিবেশে যতই গম্ভীর থাকার চেষ্টা করুক ছেলেটা, অভিজ্ঞান দিব্যি বুঝতে পারছেন ওর চোখেমুখে একটা দুষ্টুমিষ্টি ব্যাপার আছে। মেয়েটির পাশের চেয়ারে জায়গা না পেয়ে ছেলেটি ওর পেছনের সারির চেয়ারে গিয়ে বসল। অভিজ্ঞান যদি খুব ভুল না হন তাহলে একটু পরেই এই ছোকরা ওর সামনে বসে থাকা ঝাঁকড়া চুলের মেয়েটির মাথায় একটা গাঁট্টা গোছের কিছু মারতে চলেছে। অন্তত ওর হাবভাব তো তাই বলছে। অভিজ্ঞান চোখ সরিয়ে আবার মন্দার বক্তব্যে মন দিলেন। কিছুক্ষণ পর মন্দাক্রান্তা ওর বক্তব্য শেষ করে নিজের চেয়ারে এসে বসলেন। এবার অভিজ্ঞানের কিছু বলার পালা।

২

কেমিস্ট্রি ল্যাবে ঢুকে এদিক-ওদিক দেখল শাশ্বত। রাজর্ষি, বাসবীরা কেউ আসেনি এখনও। শাশ্বত ফিজিয়োলজির ছাত্র। তবে কেমিস্ট্রির প্রতি ভালোবাসা থেকে রাজাবাজার সায়েন্স কলেজের কেমিস্ট্রি বিভাগেই ওর বন্ধুর সংখ্যা বেশি। বন্ধুদের সঙ্গে ক্যান্টিনে বসে শক্তি-সুনীল নিয়ে চর্চা করতে দিব্য লাগে ওর। তবে সাহিত্যের বিষয় উঠলে সবথেকে ভালো আড্ডা জমে বাসবীর সঙ্গে। ওদের কাউকে না পেয়ে নিজের ডিপার্টমেন্টের দিকে এগোতে যাবে এমন সময় দেখল, দরজা দিয়ে ঢুকে আসছেন বাণীম্যাম। কেমিস্ট্রি ল্যাবে ওর বারবার ছুটে আসার অন্যতম কারণ, কোনো এক দুর্বোধ্য কারণে রিসার্চার বাণীশ্রী গুহর মায়া পড়ে গেছে শাশ্বতর ওপর। অবশ্য মায়া-মমতার ব্যাপারে নারীজাতির বিচার-বিবেচনা বুঝতে যাওয়া অর্থহীন। স্নেহ বড়ো ছোয়াঁচে হয়। বাণীশ্রীকে দেখেই শাশ্বত ছুটে গেল ওর কাছে। শিশুর মতো আবদারের সুরে বলল, — আমায় কবে লাউয়ের পায়েস খাওয়াবেন ম্যাম?

মিসেস গুহ হাতের ফাইলগুলো টেবিলের ওপর রেখে শাশ্বতর চিবুক ছুঁয়ে বললেন, — খাওয়াব বাবা। নিশ্চয়ই খাওয়াব। আগে বলতো সকালে কী খেয়ে এসেছিস?

— চায়ে ভিজিয়ে পাউরুটি।

— ব্যস?

— হ্যাঁ। আজকে রান্না করতে ইচ্ছে করল না একদম। মার্কণ্ডেয় পুরাণ নিয়ে একটু চর্চা করছি আজকাল। ওতেই সকালটা কেটে গেল।

ছেলেটার বিভিন্ন বিষয়ে আগ্রহ আর অদম্য ইচ্ছেকে প্রশ্রয় দেন মিসেস গুহ। মৃদু হেসে ওকে বললেন, — কিছুই তো খাসনি সকাল থেকে। আমার ব্যাগে চিঁড়ের পোলাও আছে। খেতে খেতে পুরাণ চর্চা করি?

— না ম্যাম। এখন একটু ক্যান্টিনে যাব। চিঁড়ের পোলাওটা তোলা রইল।

— ক্যান্টিনে কে আছে? আমাদের বাসবী?

— হ্যাঁ।

— ও কিন্তু আমার খুব প্রিয় ছাত্রী শাশ্বত। সামলে রাখিস।

— ম্যাম, আমরা তো বন্ধু! মানে, শুধু বন্ধুই আর কি।

— আচ্ছা! তা বন্ধুকেও তো সামলে রাখা যায়। যায় না?

— হ্যাঁ।

কোনোমতে ঘাড় নেড়ে বাণীম্যামের চোখের আড়াল হলো শাশ্বত। পালিয়ে বাঁচল যেন। রাজর্ষিরা সবসময় ওর সঙ্গে বাসবীকে জড়িয়ে টোন-টিপ্পনি কাটে বটে। তবে ওর মনে যে বাসবীর জন্য কী আছে সেটা ও এখনও বুঝতে পারে না। শুধু নতুন কোনো কবিতা পেলে সেটা বাসবীকে না শোনাতে পারলে, আলোচনা না করতে পারলে ওর আপশোশ হয়। ক্যান্টিনে ঢুকে দেখল এখনও সে এসে পৌঁছায়নি। রাজর্ষি, রুদ্র, মেঘা সবাই ওকে দেখতে পেয়ে হাত নেড়ে ওদের টেবিলে ডেকে নিল। পুজোর আগে আজকে ওদের শেষবারের মতো কলেজে আসা। এমনিতেই কোভিডের জন্য বেশিরভাগ সময় বন্ধ থাকছে কলেজ। বাসবী কি ভুলে গেছে? আবার তো দেখা হবে সেই পুজোর পরে।

৩

কনফারেন্স রুম থেকে বেরিয়ে মেডিক্যাল কলেজের সামনের হলঘরে এসে পৌঁছাল অভিজ্ঞান মুখার্জি। বুফের আয়োজন চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে, যার থেকে বিভিন্ন খাবারের স্বাদু গন্ধ আসছে নাকে। প্লেট হাতে নিয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মানুষের থেকে একটু তফাতে সরে এলেন অভিজ্ঞান। ফোনে বেশ কিছুক্ষণ আগে আসা মেইলটা খুলে দেখলেন এবার। যা ভেবেছিলেন তাই, লালবাজার ওকে সি আই ডিপার্টমেন্টে চাইছে। কিছু অজানা ছিল না অবশ্য। গুজরাট থেকে অধ্যাপনায় ইস্তফা দেওয়ার ইচ্ছেটা বন্ধু পান্ডেকে জানাতেই, দরাজ গলায় ওকে ক্রাইম ইনভেস্টিগেটিশন

ডিপার্টমেন্টে যোগ দিতে বলেছিলেন জয়েন্ট-কমিশনার দ্বৈপায়ন পান্ডে। অভিজ্ঞানের আমেরিকার পি এইচ ডি র জন্য হোক বা খুনির মনস্তত্ত্ব বোঝার মুনশিয়ানার জন্যই হোক, ওই কথার পরেই অভিজ্ঞান একপ্রকার নিশ্চিত ছিলেন আবার ওকে কলকাতায় থিতু হতে হবে। তবে ডাকটা এত তাড়াতাড়ি আসবে সেটা ভাবতে পারেননি। ফোনটা সাইলেন্ট মোড থেকে ভাইব্রেশন মোডে করে প্যান্টের পকেটে রেখে দিলেন। সামনে তাকাতেই দেখেন হলের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মন্দার সঙ্গে কথা বলছে একটু আগে কনফারেন্স রুমে দেখা ওই কৌতূহলী চোখের মেয়েটা। এখান থেকে ওদের কথা শুনতে না পেলেও দুজনের দাঁড়ানোর ভঙ্গি, পরস্পরকে দেখার চাহনি দেখে মনে হচ্ছে মেয়েটার সঙ্গে মন্দার বেশ ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। তাহলে মন্দার কোনো ছাত্রী হবে, র‍্যানডাম গেস্ট নয়। ওকে দেখে ওর সঙ্গে আসা শার্ট পরা ছেলেটার কথা মনে পড়ল অভিজ্ঞানের। এদিক-ওদিক তাকাতেই দেখলেন, হিন্দু কলেজের আইনের অধ্যাপক জয়রাম বাগচির সঙ্গে বুফে টেবিলের সামনে ঘুরঘুর করতে করতে কথা বলছে ছেলেটা। একহাতে প্লেট নিয়ে, অন্য হাতের আঙুল নেড়ে নেড়ে মিস্টার বাগচি ওকে কিছু ব্যাখ্যা করছেন আর ও ঘাড় নেড়ে নেড়ে টেবিলে রাখা বড়ো বাটি থেকে সুপ... এটা কী করছে ছেলেটা! অভিজ্ঞান পরিষ্কার দেখলেন, যে চামচ দিয়ে সাধারণ মানুষ সুপ খায় সে ছোটো চামচ দিয়ে ও নিজের বাটিতে সুপ তুলছে। তারপর ওকে আরও অবাক করে দিয়ে ছেলেটা সুপের হাতা তুলে নিয়ে এগোতে যাচ্ছিল, কিন্তু পরক্ষণেই নিজের এই কিম্ভূত আচরণ বুঝতে পেরে সুপের হাতা জায়গা মতো রেখে দিয়ে নিজের জায়গা পরিবর্তন করল। অভিজ্ঞানের মনে হল ছেলেটা হয় অ্যাটেনশান সিকার, নয়তো মিস্টার বাগচির কাছে এমন কিছু শুনেছে, যা ওকে অবাক করেছে। দ্বিতীয়টা হয়ে থাকলে ও অবাকবশত তাল হারিয়ে ফেলেছে হয়তো। অভিজ্ঞান মুখার্জির বিশ্লেষণে ছেদ পড়ে ওর বন্ধু মন্দার আগমনে।

— অভি, ও আরোহী দত্ত। বিদ্যাসাগর কলেজে সাইকোলজিতে অনার্স পড়ছে। এখন সেকেন্ড ইয়ার। ক্রিমিনাল সাইকোলজিতে ওর ভীষণ আগ্রহ, তাই ওকে তোর কথা বলছিলাম।

মন্দার বক্তৃতা চলাকালীন যাকে নিরীক্ষণ করছিলেন অভিজ্ঞান, এবার তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন,— হ্যালো আরোহী! আমি অভিজ্ঞান মুখার্জি। গুজরাটে ন্যাশনাল ফরেনসিক সায়েন্স ইউনিভার্সিটি'তে ক্রিমিনাল সাইকোলজি পড়াই... সরি, পড়াতাম।

শেষ কথাটুকু শুনে মন্দাক্রান্তা অবাক হন। জিজ্ঞেস করেন,

— 'পড়াতাম' মানে? এখন আর...

বন্ধুর প্রশ্নবোধক চোখে চোখ রেখে অভিজ্ঞান বলেন,

— এরপর কনসালটেন্ট ক্রিমিনোলজিস্ট — হোমিসাইড ডিপার্টমেন্ট, লালবাজার।

মন্দাক্রান্তার প্রশ্নবোধক চোখকে অবাক চোখে পালটাতে দিয়ে অভিজ্ঞান সদ্য পরিচিত মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলেন, — আরোহী, পড়াশোনা ছাড়া আর কী করছ?

স্বতঃস্ফূর্ত কণ্ঠে উত্তর এল,— ইন্টার্নশিপ খুঁজছি।

— আচ্ছা! তোমার চোখ দেখে অবশ্য মনে হয়েছিল যে সারাক্ষণ কিছু একটা খুঁজছ। ইন্টার্নশিপ খুঁজছ তাহলে!

কনফারেন্স রুমে অভিজ্ঞান মুখার্জির বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হয়েছিল আরোহী। ওরকম ছক্কভাঙা সপ্রতিভ বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হওয়া স্বাভাবিক। তারপর উনি মন্দাক্রান্তাম্যামের বন্ধু শুনে ওর নিজের মুগ্ধতার প্রতি ভরসা হয়েছিল। এখন মুগ্ধতার পারদ আর-একটু চড়ল অভিজ্ঞান মুখার্জির হিউমার দেখে। ঠিক বুঝিয়ে দিলেন ওকে অবসার্ভ করছিলেন। উত্তরে এবার স্মার্টলি বলল আরোহী, — হ্যাঁ। ইন্টার্নশিপ খুঁজছি। আপনি করাবেন?

— আমি?

কথাটা বলার সময় আরোহী ভাবেনি। কিন্তু বলে ফেলে মনে হচ্ছে, সিলেবাসের পড়া পড়তে পড়তে ক্রিমিনাল সাইকোলজিতে ইন্টার্নশিপ করলে মন্দ হয় না। ক্রিমিনোলজির প্রতি নিজের আগ্রহটা আরও মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে যেন। অভিজ্ঞানের বিহ্বল চোখের দিকে তাকিয়ে ও ঝোঁকের বশে যুক্তি কষে ঠিক করে ফেলল, কলেজের ফাঁকে ফাঁকে ও অভিজ্ঞান মুখার্জির কাছে ক্রিমিনোলজিতে ইন্টার্নশিপ করবে। করবেই।

৪

এই মুহূর্তে লালবাজারে জয়েন্ট কমিশনার দ্বৈপায়ন পান্ডের সামনের টেবিলের উলটোদিকে রাখা চেয়ারে বসে আছেন অভিজ্ঞান মুখার্জি। জরুরি তলব করে ওকে ডেকে পাঠিয়েছেন পান্ডে। ভবানীপুর থানার ডিফেন্স অফিসার তনয়া মজুমদার গত একসপ্তাহ যাবৎ নিখোঁজ। বয়স সাতাশের তনয়া গত সপ্তাহে ছুটি কাটাতে বোলপুরে গেছিলেন। বাড়ির লোকজন কেউ যায়নি অবশ্য। পান্ডে জানালেন, ছুটি পেলে এরকম ছোটোখাটো টুরে তনয়া একাই যেতেন। ওর বাড়ি ভবানীপুরে। বাবা-মা নেই। দাদা, বউদি এবং পিসির সঙ্গে তনয়া থাকতেন। অভিজ্ঞান তনয়ার পাস্ট রেকর্ড চাইলে পান্ডে বেল চেপে একজনকে ভেতরে ডেকে নিলেন। হাতে চায়ের কেটলি আর কাগজের কাপ নিয়ে যে প্রবেশ করল তাকে দেখে অভিজ্ঞান বেশ অবাকই হলেন। ভদ্রলোকের বয়স ত্রিশের কোঠায়। অবশ্য ওর ছিরিছাঁদ দেখে ঠিক ভদ্র বলে ঠাহর হয় না। গায়ে আর্দালির পোশাক থাকলেও সেটায় কোনো বোতাম না থাকায় ভেতরের বহুদিন না-কাচা স্যান্ডো গেঞ্জিটি বুকের লোমের সঙ্গে লেপটে আছে। প্যান্টের হতশ্রী অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার

আগেই লোকটি তার হাতের কেটলি এগিয়ে ধরে জিজ্ঞেস করল,— স্যার চা খাবেন? চা দেব?

লোকটির বাহ্যিক ছিরিছাঁদের সঙ্গে গলার স্বরের আশ্চর্য অমিল দেখে আর-একবার অবাক হলেন অভিজ্ঞান। বেশ গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর। ক্রিমিনোলজিস্ট অভিজ্ঞানের মনে হল, এই কণ্ঠের লোকেরা খুব ভালো থেকে শুরু করে খুব খারাপ পর্যন্ত যে-কোনো কাজ খুব নিখুঁতভাবে করতে পারে। পান্ডে ওঁর ঘরের আশপাশটা একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে অভিজ্ঞানের দিকে চেয়ার এগিয়ে নিয়ে ওর পরিচয় দিয়ে বললেন,

— অভি, এ হল মংলু। আমাদের অনেক পুরোনো ইনফর্মার। ওকে এখানে সবাই 'খ্যাঁচা মংলু' বলে চেনে। তনয়ার ব্যাপারে যাবতীয় অফিশিয়াল তথ্য তুমি এই ফাইলে পেয়ে যাবে। তবে আনঅফিশিয়াল কোনো খবরাখবর দরকার হলে মংলু তোমায় সাহায্য করবে। কেমন?

মংলু লোকটা বেরিয়ে যেতেই অভিজ্ঞান আর-একবার অবাক হয়ে দেখেন, কাগজের চায়ের কাপের নীচে আর-একটা ভাঁজ করা কাগজ ও পান্ডের জন্য রেখে গেছে। কাগজে যে গুরুত্বপূর্ণ কোনো তথ্য আছে তা বলা বাহুল্য। পান্ডের থেকে ফাইলটা নিয়ে অভি বলল,

— বেশ। তনয়া মজুমদারের কোনো ট্রেস এভিডেন্স? আই মিন এনি ক্লু?

— নাথিং। ফোনের লাস্ট লোকেশন দেখাচ্ছে শিয়ালদহ স্টেশন চত্বর। তারপর যেন কর্পূরের মতো উবে গেল।

— স্ট্রেঞ্জ!

— হুমম! সি আই ডির অফিসাররা ওদের মতো করে খোঁজখবর নিচ্ছেন। তুমি তোমার মতো করে ভাবতে থাকো মুখার্জি।

— শিয়োর পান্ডে। ডিটেইলস চেক করে দেখি আগে। এখন আসছি।

চেয়ার থেকে উঠে ঘুরে দাঁড়াতেই মংলু লোকটার ওপর চোখ পড়ল অভিজ্ঞানের। সামনে থেকে ভালো করে লক্ষ করে বুঝলেন, ঘাড়ের পরতে পরতে জমে থাকা আলগা ময়লার স্তর ওর বহুদিন স্নান না করার সাক্ষী। থানা চত্বরের বাকিদের চোখ এড়িয়ে ওর সঙ্গে নিজের ফোন নম্বর চালাচালি করে অভিজ্ঞান লাল দালান থেকে বেরিয়ে এলেন। পার্কিং এরিয়ায় পৌঁছে নিজের গাড়ির সামনে আরোহী এবং ওর সঙ্গের ছোকরাটিকে দেখে অবাক হলেন। একবার ভাবলেন বুঝি ভুল গাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। ছেলেটাই কথা শুরু করল,

— নমস্কার স্যার, আমি ঈশান চৌধুরী।

— হিন্দু কলেজের আইন বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষে পড়ছ। জয়রাম বাগচির ছাত্র। তাইতো?

— হ্যাঁ। আপনি কীভাবে জানলেন?

— জানতে হয়। এখানে কী চাই বলো?

— ইন্টার্নশিপ চাই স্যার। দাঁতের দুইপাটি দেখিয়ে উত্তর দিল ঈশান।

— তোমারও ইন্টার্নশিপ চাই?

— ঈশান ঘাড় হেলিয়ে দিলে আরোহী বলল,

— স্যার আপনাকে আমার সিভিটা মেইল করেছিলাম। বলেছিলেন আজকে দেখা করতে। তাই সোজা এখানেই চলে এলাম। কাজটা কাজের জায়গা থেকেই শুরু করা ভালো।

— তা তো বুঝলাম আরোহী। কিন্তু তুমি এগজ্যাক্টলি কী করতে চাও সেটা আগে ভাবো! তোমার ম্যাম মন্দাক্রান্তা বলছিলেন, তুমি ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি নিয়ে পড়তে চাও। আমাকে পাঠানো সিভিতে লিখেছ ক্রিমিনাল সাইকোলজিতে তুমি ইন্টারেস্টেড। সো আগে নিজে ডিসাইড করো নিজে কী করতে চাও?

— আরোহী চুপ করে গেলে ঈশান হাসিমুখে বলল, — আর স্যার আমি কী করব?

— তুমি আগে সুপের চামচ দিয়ে সুপ খেতে শেখো। তারপর ইন্টার্নশিপ করার কথা ভাববে।

ঈশানের চোয়াল ঝুলিয়ে দিয়ে অভিজ্ঞান এগিয়ে গিয়ে গাড়ির দরজা খোলেন। একটু ভেবে নিয়ে ঈশান বলে,

— তেরোই মার্চ ভবানীপুর থানার একজন পুলিশ অফিসারের নিখোঁজ হওয়ার খবরে সরগরম লালবাজার। কিন্তু আগের মাসে চোদ্দই ফেব্রুয়ারি দুই-একটা নিউজ চ্যানেলে দেখিয়েছিল কার্গিল বর্ডারের সেনা সুরভি সাউ নিখোঁজ। যদিও বেশিরভাগ মিডিয়া চ্যানেলই সেদিন ব্যস্ত ছিল অন্যান্য খবর নিয়ে। সুরভি সাউয়ের খবরটা তাই চাপা পড়ে যায়। যদিও সুরভির পরিবারের সদস্যরা থানায় কেস করেছিল। সেদিন জয়রামস্যারের সঙ্গে এই ব্যাপারেই আলোচনা হচ্ছিল যে তনয়া মজুমদার এবং সুরভি সাউয়ের নিখোঁজ হওয়ার মধ্যে কোনো যোগসূত্র আছে কিনা? তখনই আমি অন্যমনস্ক হয়ে সুপের চামচ আর হাতা গুলিয়ে ফেলেছিলাম স্যার।

অভিজ্ঞান এই প্রথম ছেলেটাকে গভীরভাবে দেখলেন। আপাতদৃষ্টিতে একটা মজারু ইমেজ নিয়ে থাকলেও গভীরতা বোঝার ক্ষমতা ওর আছে। সুরভি সাউয়ের কেসটা শুনে ওর প্রতি কিছুটা কৃতজ্ঞও হলেন। ওদের কাছে এগিয়ে এসে মুখ খোলার আগেই ঈশান বলে,

— বাকি কথা আমরা যেতে যেতে বলি স্যার? মানে ইন্টার্ন হিসেবে...

ঈশানের কথায় তাল মিলিয়ে আরোহী বলল,

— আমি ভেবে নিয়েছি স্যার। আপাতত ক্রিমিনোলজিটা শিখি আপনার কাছে। তারপর ভাবা যাবে কী করব।

— বেশ। তোমরা আমার গাড়িতে উঠে এসো।

দুজনে পেছনের সিটে উঠে বসলে অভিজ্ঞান ওদের নিয়ে গাড়িতে স্টার্ট দিলেন।

৫

পুজোর আগে শেষ মুহূর্তের কেনাকাটা করতে বাসবী আর শাশ্বত এসপ্লানেড চত্বরে ঘুরছে এখন। ওরা বেরিয়েছিল কলেজ স্ট্রিটে বই কিনতে। হাতে ব্যাগভরতি বই নিয়ে এসপ্লানেডে ঘোরার একদম ইচ্ছে ছিল না বাসবীর। শাশ্বত জোর করে নিয়ে এসেছে ওকে। এখন অলিগলি ঘুরে ঘুরে অ্যারোমা ক্যান্ডেল কিনছে শাশ্বত। এত মোম দিয়ে ও কী করবে জিজ্ঞেস করলে বাসবীর দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হেসে শাশ্বত বলে,

— গলাব

— মানে?

— মোম গলিয়ে মোম বানাব।

— ওহ্ তুমি এসবও জানো?

উত্তরে আর-একবার হেসে সামনের দোকানের দিকে এগিয়ে যায় শাশ্বত। বুটিকের শাড়ি দিয়ে সাজানো দোকানে ঢুকে বাসবীর চোখ জুড়িয়ে যায়। শাড়ি দেখতে দেখতেই ওর ফোন বেজে ওঠে। স্ক্রিনে দেখে আরোহী ফোন করছে। কাচের দরজা ঠেলে বেরিয়ে ফোনটা রিসিভ করে বাসবী,

— হ্যাঁ আরু বল!

— দিদি... আমি ইন্টার্নশিপ পেয়ে গেছি।

— তাই!

— ইয়েস! তাও ক্রিমিনাল সাইকোলজিতে!

— বলিস কী! ড্রিম ফুলফিল তো তাহলে!

— অলমোস্ট! আজকে তো জাস্ট শুরু হল। আমি বাড়ি এসে দেখি তুই নেই। জেম্মা বলল তুই নাকি সকালেই বেরিয়ে গেছিস। কোথায় আছিস এখন?

— এখন নিউ মার্কেটে আছি রে। ফিরব এখনই। তুই ইন্টার্নশিপ কোথায় পেলি যেন?

— তুই ফের তো আগে। তারপর সব বলব।

আরোহী ফোন রেখে দিলে বাসবী কাচের দরজা দিয়ে দেখল ভেতরে শাশ্বত একজন মধ্যবয়সি মহিলার সঙ্গে কথা বলছে। সম্ভবত উনি এই বুটিক হাউসের মালকিন। বাসবী ভাবল আরোহী ইন্টার্নশিপ শুরু করছে আর সামনেই পুজো। ওর জন্য একটা জামা কিনে নেবে এখান থেকে। ও ভেতরে ঢুকলে শাশ্বত ওকে ডেকে বলল,

— বাসবী, ইনি এই বুটিক হাউসের ওনার — মিসেস বৈজয়ন্তী বাসু।

— হাই!

মিসেস বাসু অমায়িক ব্যবহার করলেন ওদের সঙ্গে। প্রাথমিক আলাপ করার পর কেনাকাটা করে ওরা বেরিয়ে এসে মেট্রোর দিকে হাঁটতে শুরু করল। পথে একটা মিট শপে খাসির মাংস ঝুলতে দেখে শাশ্বত থমকে দাঁড়িয়ে বুক ভরে শ্বাস নিল। বাসবী ওর দিকে একটু অবাক হয়ে তাকালে শাশ্বত হেসে বলল,

— অনেকদিন কষা মাংস খাই না।

— তুমি বাড়ি যাবে না পুজোর ছুটিতে?

— হ্যাঁ। যাব তো! তখন জমিয়ে মাংস খাব।

— আচ্ছা। এখন চলো দেরি হয়ে যাচ্ছে। তুমি তো গিরিশ পার্কে নেমে যাবে। আমাকে দমদম অবধি যেতে হবে।

৬

পুজোর আগের এই সময়টায় রাস্তায় এত জ্যাম যে সল্টলেক থেকে বাগুইআটি পৌঁছাতে পাক্কা দেড়ঘণ্টা লেগে গেল। ফ্ল্যাটের তালা খুলতে খুলতে কলকাতার রাস্তাঘাটের গুষ্টির তুষ্টি করতে থাকল ঈশান। ঈশানের বাড়ি বর্ধমানে। কলকাতার কলেজে ভরতি হওয়ার পর থেকে বাগুইআটিতে এই দুই কামরার ফ্ল্যাটে থাকছে একবছর হল। প্রথমে হন্যে হয়ে যখন ফ্ল্যাট খুঁজছিল তখন দমদমের একটা মেসে শেয়ারে থাকত। কলেজের ডিপার্টমেন্টাল হেড জয়রাম বাগচির খুব ভালো লেগে গেল ওঁর ছাত্র ঈশানকে। ছেলেটা ওর হিউমার দিয়ে অদ্ভুত কায়দায় কথা বলতে জানে। অভিজ্ঞ জয়রাম বাগচির মনে হয়, কথার খেলাটা আইনের ফাঁক-ফোঁকরে চালিয়ে খেলতে পারলে ওর উকিল হওয়া আটকানো কার সাধ্য! ফার্স্ট ইয়ারের রেজাল্টে দেখা গেল, ফার্স্ট হয়েছে ঈশান চৌধুরী, কিন্তু কলেজে সেদিন ওর টিকিও দেখা গেল না। ওইদিন তুমুল জ্বর নিয়ে মেসে পড়ে ছিল ঈশান। জয়রাম বাগচি ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে ওঁদের ছেলের জন্য বাগুইআটিতে কিনে রাখা ফ্ল্যাটে ঈশানকে এসে থাকতে বলেন। বাগচির ছেলে বিদেশে থাকে, তাই ফ্ল্যাটটা ফাঁকাই পড়ে আছে। ঈশান এসে থাকলে ভালোই হবে। আর ওর সুবিধা-অসুবিধায় বাগচিরা ওকে দেখতেও পারবে। ঈশান প্রথমে আপত্তি করলেও বাগচিস্যার বলেছিলেন, ফাঁকা ঘরবাড়িতে ধুলো জমার থেকে ব্যবহার হওয়া ভালো। ঈশান ভাড়া দিতে চাইলে এককথায় নাকচ করেছিলেন বাগচি দম্পতি। ঈশানের বাবা-মায়ের কোনো ওজর-আপত্তিও শোনেননি ওঁরা। শুধু ঈশানকে বলেছিলেন ভালো করে পড়াশোনা করতে। তা পড়াশোনা আর হাইকোর্টের কেস ফাইল ঘেঁটে ঘেঁটে দেখা সবটাই ঈশান মন দিয়ে করছিল আরোহীর সঙ্গে ওর দেখা হওয়ার আগে অবধি। সেদিন কনফারেন্সে যাওয়ার জন্য ট্রামে উঠে ওর কাছে

খুচরো চাওয়া, তারপর অভিজ্ঞান মুখার্জির কাছে ইন্টার্নশিপ করার জন্য ওর ফোন নম্বর চাওয়া, কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা করা, সবমিলিয়ে ঈশানের মনে হচ্ছে ওকে শীঘ্রই নিছক ছাত্রাবস্থা থেকে অব্যাহতি দিয়ে জেন্টলম্যান হয়ে উঠতে হবে। ঘরে ঢুকে মা-কে টেক্সট করে দিল ও পৌঁছে গেছে। বর্ধমান কেন, পৃথিবীর যে-কোনো প্রান্তে থাকলেও এই মা মহিলাটি ওর জন্য চিন্তা করেন। এদিকে ফোন বেজে উঠলে মায়ের সিরিয়াল দেখায় ব্যাঘাত ঘটবে, তাই টেক্সট করে দিয়ে ঈশান ফ্রেশ হতে গেল। এসে স্টোভে চায়ের জল বসিয়ে ও ল্যাপটপ খুলে বসল। তনয়া মজুমদারের ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাডি করার দায়িত্ব ওর। আর সুরভি সাউয়ের কেসটা স্টাডি করার দায়িত্ব আরোহীকে দিয়েছে অভিজ্ঞানস্যার। ওদের কাজ হল এই কেসদুটোর মধ্যে কোনো লিঙ্ক আছে কিনা খুঁজে বের করা। তাহলে খুনের একটা মোটিভ বুঝে পরবর্তী টার্গেটকে সাবধান করা যাবে। অভিজ্ঞানস্যারের দেওয়া লিঙ্কগুলোতে ঘুরে ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করতে করতে ঈশানের মনে হল তনয়া মজুমদারের সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যাকাউন্টটা একবার দেখা দরকার। এমন সময় ওর ফোন বেজে উঠলে দেখে আরোহী ফোন করছে। ফোনটা ধরতেই আরোহী উত্তেজিত গলায় বলল,

— ঈশান, তাড়াতাড়ি একবার চেক করে দেখতে পারবি তনয়া মজুমদারের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট আছে কিনা?

— আমি সেটাই চেক করতে যাচ্ছিলাম। কেন? কী হয়েছে?

— চেক করে বল তারপর বলছি।

দ্রুত হাতে একবার সামাজিক মাধ্যমে দেখে নিয়ে ঈশান বলল,

— নাতো, নেই!

— সেটাই ভাবছিলাম। অ্যাকাউন্ট ডি-অ্যাক্টিভ্যাটেড। সুরভি সাউয়েরও সেম কেস।

— তাই নাকি?

— হ্যাঁ। ভেবে দ্যাখ, অভিস্যার কিন্তু বলেছিলেন, অফিসার তনয়া যখন ট্রিপে যেতেন সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি পোস্ট করতেন। তাহলে ওর তো সোশ্যাল মিডিয়ায় অ্যাকাউন্ট ছিল। অভিস্যার থানা থেকে সুরভি সাউয়ের যে ফাইল পেয়েছিলেন, সেখান থেকে সুরভির বাড়ির নম্বর নিয়ে জানতে পারলাম সুরভিরও অ্যাকাউন্ট ছিল সোশ্যাল মিডিয়ায়।

— আরোহী, আমাদের তাহলে জানতে হবে কবে এই অ্যাকাউন্ট দুটো ডি-অ্যাক্টিভেট করা হয়েছে? ওদের নিখোঁজ হওয়ার আগে না পরে?

— ঠিক। ওদের পারিবারিক ব্যাকগ্রাউন্ডে তেমন একটা কিছু মিল পেলাম না। তবে একজন পুলিশ অফিসার, অন্যজন বর্ডারের সেনা। পেশাগত দিক থেকে এরা দুজনেই কিন্তু দেশের ডিফেন্সের সঙ্গে যুক্ত।

— সেটা আমাকে জয়রামস্যারও বলছিলেন। তাহলে আমাদের ডিফেন্সকে দুর্বল করে দিতে চাইছে কোনো বহিরাগত শত্রু? এর পেছনে কি বড়ো কোনো মাথা কাজ করছে?

— ঈশান, সেরকম কিছু হলে আরও প্রভাবশালী কেউ টার্গেট হত না কি? সুরভি এবং তনয়া দুজনেই ওদের কেরিয়ারটা শুরু করেছিল সবে। কাজের ক্ষেত্রে ওদের কন্ট্রিবিউশন অবশ্যই ছিল, কিন্তু ওরা তো বড়ো কোনো নাম নয়। অভিজ্ঞানস্যার সেদিন স্পিচ দেওয়ার সময় বলেছিলেন না, যে-কোনো সিরিয়াল কিলারের কাছে ইগো খুব ম্যাটার করে... তাহলে কিলার যদি তোর কথা মতো বড়ো কোনো মাথা হয় সে তো বড়ো মাথাদেরই টার্গেট করবে। তনয়া বা সুরভিকে কেন?

— ঠিকই বলেছিস। তাহলে কী হতে পারে বল তো?

— মোটিভটা নিয়ে একটু ভাবতে হবে। আচ্ছা কাল চল স্যারের সঙ্গে বসে দেখি নতুন কিছু পাওয়া যায় কিনা!

— হ্যাঁ সেই ভালো।

ফোনটা রাখার পর ঈশান ভাবল, মেয়েগুলো এভাবে নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছে! মারা গেলে ওদের লাশও পাওয়া যাচ্ছে না! ওরা নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছে কোথায়?

৭

সকালে স্নান সেরে এসে ড্রেসিং টেবিলের সামনে নিজের চুল শুকোতে শুকোতে ওঁর নিরাপত্তারক্ষীদের ফোন করতে থাকলেন সাংসদ শৈলজা মিত্র। সবাইকে কঠোরভাবে জানিয়ে দিলেন, দিন দুয়েকের জন্য ঘুরতে যাচ্ছেন। একাই যাবেন, তাই কেউ যেন ওঁকে বিরক্ত না করে। নিজের মনমতো তৈরি হয়ে ড্রাইভারকে ফোন করতে গিয়ে ওঁর চোখ পড়ে গতকালের আঁকা তেলরঙের ছবিটার দিকে। নিজের অজান্তেই নিজের আঁকা ছবির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেন,

— কোথায় থাকবে তুমি? শোয়ার ঘরের দেয়ালে আটকে রাখি তোমায়? অবশ্য তুমি তো চার দেয়ালের গণ্ডিতে থাকার মানুষ নও।

ছবিটা নিজের শয়নকক্ষের দেয়ালে আটকে রেখে ও নীচে এসে গাড়িতে উঠে বসলেন। বেহালার ওপর দিয়ে চলতে চলতে নিজের ফোনটা বন্ধ করে দিলেন। যার কাছে আজ যাচ্ছেন তার ফোন পছন্দ নয় একদম। ও বলে,

— মানুষ থাকতে যন্ত্রের কী দরকার? যন্ত্রই যত যন্ত্রণার কারণ। সব মানুষকে যন্ত্র বানিয়ে দিচ্ছে।

টালিগঞ্জ মেট্রোর সামনে গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়লেন শৈলজা। ড্রাইভারকে বললেন চলে যেতে।

মেট্রো থেকে বেরিয়ে নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে কাঁপা কাঁপা হাতে দরজার কলিং বেল বাজালেন। ওপাশ থেকে দরজা খুলে শৈলজাকে দেখে বলল,

— আসুন ম্যাডাম। আপনার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম

ঘরে ঢুকে রোদচশমা খুলে ব্যাগে রাখতে রাখতে শৈলজা বলেন,

— তুমি কি এখনও আমায় 'তুমি' বলবে না?

— আপনি বসুন।

— তুমি আমার মুখোমুখি বোসো। কথা আছে।

— বলুন।

— আমায় 'তুমি' বলে ডাকো প্লিজ। সবাই আপনি-আজ্ঞে করে দূরে সরিয়ে দেয়। কত ষড়যন্ত্র করে দেখছ তো!

— হ্যাঁ কানে এসেছে।

— কেউ ভালোবাসে না, কেউ না।

— আমাকেও কেউ ভালোবাসে না ম্যাডাম।

— তুমি একথা বলছ! কত বন্ধু আছে তোমার!

— মা তো নেই। মা নেই বলে আমি যে অসহায় সেটা বন্ধুরা বোঝে। ওরা ভালোবাসে না বলব না। তবে সেটা করুণা থেকে, দয়া থেকে বাসে।

— আমরা দুজনেই একা তাই না?

— হুমম, তবে আপনি একা, কারণ একাকিত্বটাই আপনি চেয়েছেন ম্যাডাম। আপনার তো মেয়ে আছে। সে কেন বাইরে থেকে পড়ছে আপনাকে ছেড়ে?

— ওর তো কেরিয়ার আছে, সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আছে বলো। ওকে আটকে রাখা যায়?

— তাহলে রাজ্যের সাংসদ হয়ে সন্তানকে অন্য দেশে কেরিয়ার গড়তে পাঠিয়ে দিয়ে কী প্রমাণ করতে চাইছেন এই রাজ্যে ভবিষ্যৎ নেই? তাইতো দাঁড়াচ্ছে না ম্যাডাম? আমার মা-ও চাইত আমি বড়ো হয়ে ওই কেরিয়ার! খুব ভালো কেরিয়ার হোক আমার সেটা মা চাইত। কিন্তু মা না এই 'খুব ভালো'র মাপকাঠিটা বুঝতে পারেনি। আপনার রাজ্যের 'ছোটোলোক' শ্রেণির লোক ছিল তো মা! ভাবত সরকার ভালো, সরকারি কলেজ ভালো, সরকারি চাকরি ভালো। আমাকে তাই কোনোদিন বলেইনি অন্য কোথাও মাকে ছেড়ে যেতে। উলটে দেখুন, নিজেই কেমন চলে গেল আমাকে রেখে।

— তুমি মন খারাপ করলে আমার আরও কষ্ট হয়। আরও অসহায় লাগে।

— আপনাকে না বলেছি ছবি আঁকতে!

— এঁকেছি তো। আমার ফ্ল্যাটে এসো একদিন। তোমায় দেখাব।

— বেশ। আপনি কী খাবেন বলুন। নিয়ে আসি।

— না না। কথা বলি। কথা বলার লোক পাই না। তুমি বলো আমি শুনি।

— কথা তো হতেই থাকবে। যা যা জানতে চান সব বলব। আমার কাছে যা খবর আছে বলব। একটু ওয়াইন তো চলতেই পারে। বসুন। নিয়ে আসছি।

দু-গ্লাস ওয়াইন এনে আবার শৈলজার সামনের চেয়ারে বসে বলল,

— নিন ম্যাডাম। চিয়ার্স!

— চিয়ার্স!

— আপনার কী মনে হয়? কে আপনার ক্ষতি চায়?

— জানি না। তবে আজকাল বিরোধীদের ব্যাপারে সজাগ থাকতে গেলেও মনে হয়, সরষের মধ্যে ভূত নেই তো?

— আপনি কিন্তু ইনসিকিয়োর হয়ে পড়ছেন।

— আজকাল মনে হয়, একাকিত্ব গ্রাস করে ফেলছে আমাকে।

ওয়াইনের গ্লাসটা টেবিলে রেখে সে উঠে দাঁড়ায়। শৈলজার চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে ওঁর দু-কাঁধে হাত রেখে বলে,

— তুমিও একা, আমিও একা। এই পৃথিবীর একা দুটো মানুষ এক হয়ে গেলে কেমন হয়?

শৈলজা ছলছল চোখে ওর দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বলে, — বেশ হয়!

ওয়াইনে মেশানো রোহিপনল ড্রাগ শৈলজার শরীরে প্রভাব বিস্তার করলে তিনি জ্ঞান হারান। ওঁর এলিয়ে পড়া ঘাড়ে ইঞ্জেকশন বিঁধিয়ে দিয়ে, কানের সামনে মুখ নিয়ে সে ফিশফিশ করে বলে, — বেশ। তোমার রক্ত আমার রক্তে মিশে যাক। আমরা এক হয়ে যাব।

৮

গতকাল আরোহী আর ঈশান একেবারে ছেঁকে ধরেছিল অভিজ্ঞানকে। অভি ভেবেছিল কলকাতায় এসে একটু থিতু হয়ে বসবে। পান্ডে তো দায়িত্ব দিয়েই দিল, তার মধ্যে আবার এই দুজন। নাহ্ এদের দুজনকে অন্য কোথাও একটা হিল্লে করে দিতে পারলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে ও। লালবাজারে ফোন করতে গিয়ে ফোনের কল লিস্টের শেষ নম্বরে চোখ আটকে যায় অভির। নিতাইকাকা কাল রাতেও ফোন করেছিল। বাবা মারা যাওয়ার পর ভবানীপুরের বাড়ি থেকে একপ্রকার পাততাড়ি গুটিয়ে কলকাতায় সল্টলেকের এই বাড়িতে এসে উঠেছে অভিজ্ঞান। ভবানীপুরের বাড়ি দেখাশোনা করার দায়িত্ব বাবার বহু পুরোনো দিনের ড্রাইভার নিতাইকাকা আর ওর বউয়ের ওপর দিয়ে এসেছিল। অভি কলকাতার বাড়িতে ওঠার তিনদিনের মাথায় বাবার গাড়িটা চালিয়ে

নিয়ে এসেছিল নিতাইকাকা। চোখের জল মুছতে মুছতে অভিকে অনুরোধ করেছিল, ওই বাড়িতে ফিরে যেতে। বাবার স্মৃতি হিসেবে গাড়িটা রেখে মৃদু হেসে নিতাইকাকাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল অভি। বলেছিল, কাকিমার খেয়াল রাখতে আর ওদের ছেলে মাধবকে ভালো করে পড়াশোনা করাতে। কাল কাকা ফোন করেছিল খোঁজখবর নিতে অভি কেমন আছে। ছোটো একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে লালবাজারে ফোন করে অভিজ্ঞান। ইতিমধ্যে সুরভি সাউ এবং তনয়ার এলাকার মাস্তানদের তুলে নিয়ে গিয়ে থানায় জেরা করা হয়েছে। কোনো লাভ হয়নি। খুনি কীভাবে ভাবছে বা পরের টার্গেট কে হতে পারে এই ব্যাপারে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। এমন সময় দরজায় কলিং বেল বেজে উঠল। দরজা খুলে আরোহী, ঈশানকে ভেতরে ঢুকতে বলে অভিজ্ঞান। ওরা স্টাডিতে গিয়ে বসলে অভিজ্ঞান জিজ্ঞেস করলেন, — আজ তোমাদের কলেজ নেই?

আরোহী ঘাড় নেড়ে বলল, — কলেজ আছে তবে প্র্যাকটিকাল নেই বলে আজ যাইনি।

ঈশান বলল, — আজকে সব ক্লাস সেকেন্ড হাফে, তাই এখানে চলে এলাম।

নিজের চেয়ার টেনে বসে ওদের বোঝানোর ভঙ্গিতে অভিজ্ঞান বলেন, — দ্যাখো আমি চাই না তোমরা কলেজে ক্লাস কামাই করে এখানে আসো। সেরকম হলে কলেজ থেকে এনওসি নিয়ে এসো। আর প্রথমেই বলে রাখি, আমার কোনো ইনস্টিটিউশন নেই যে তোমরা এখানে তিনমাস বা ছমাস ইন্টার্নশিপ করলে পরে সার্টিফিকেট পাবে। তাই ভেবেচিন্তে শুরু করো।

অভিজ্ঞানের কথা শুনে আরোহী, ঈশান নিজেদের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। ওরা বুঝতে পারছে না কেস শুরু হয়ে যাওয়ার পর এই কথাগুলোর মানে কী! ওদের সন্দিহান দৃষ্টি দেখে অভিজ্ঞান বললেন,

— আমি লালবাজারে কথা বলেছি। আরোহী তুমি চাইলে ওখানে ইন্টার্নশিপ করতে পারো, তবে তোমাকে একটা অ্যাপ্টিটিউড টেস্ট দিতে হবে। কোয়ালিফাই করলে একটা ভাইভা হবে। ভয়ের কিছু নেই। উতরে গেলে লালবাজারে হোমিসাইড দপ্তরে ইন্টার্নশিপ করতে পারবে। সব ফাইল ঘেঁটে ঘেঁটে স্টাডি করতে পারবে আর ক্রিমিনালদের সামনে বসে কথাও বলতে পারবে।

আরোহীর অবাক চোখ থেকে চোখ সরিয়ে ঈশানের দিকে তাকালেন অভিজ্ঞান,

— ঈশান, আমি মিস্টার বাগচির সঙ্গে কথা বলেছি। তুমি যেরকম হাইকোর্টে গিয়ে কেস ফাইল স্টাডি করছ সেরকমই করতে থাকো। এবার থেকে একটা নোটপ্যাড বা ডায়ারি রাখবে নিজের কাছে। তোমার নিজস্ব কোনো মতামত বা থিয়োরি বা কোনো হাঞ্চ ইমিডিয়েট নোট করে নিতে পারবে। আরোহী তুমিও এটা করতে পারো।

আরোহী চুপ করে থাকলেও ঈশান বলে ফেলল, — আপনি আমাদের তাড়িয়ে দিচ্ছেন স্যার? কেন? আমরা কী দোষ করলাম?

ওর করুণ মুখের দিকে তাকিয়ে অভিজ্ঞান বিব্রতবোধ করলেন। আরোহী বলল, — ওকে স্যার! আমি লালবাজারে ইন্টার্নশিপ করার জন্য টেস্ট দেব। কিন্তু আমার তো কোনো প্রস্তুতি নেই এই বিষয়ে। বইয়ের থিয়োরিতে ক্রিমিনোলজি নিয়ে আলাদা করে কিছু নেইও আমাদের। আপনি আমাদের ক্রিমিনোলজির ক্লাস করাবেন? ইন্টার্নশিপ না; আপনার কাছে টিউশন পড়তে চাইছি।

ঈশানের মনে হল, আরোহীর প্রস্তাবটা মন্দ নয়। এভাবে একসঙ্গে পড়লে কেসটা নিয়েও আলোচনা করা যাবে। হেসে বলল,

— আপনার টিউশন ফি-টা একটু বলবেন স্যার?

অভিজ্ঞান ভালোই বুঝতে পারলেন ফাঁদে পড়ে গেছেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, — সপ্তাহে তিনদিন সন্ধে ছটার দিকে চলে আসবে। পড়িয়ে দেব। কত টাকা মাইনে দেবে সেটা মাসের শেষে কে কতটা শিখলে সেটা দেখে ডিসাইড করব। আপাতত স্যার-স্যার না বলে অভিদা বললেই হবে। টিউশন পড়বে তো! আমি তোমাদের দাদাই হলাম।

হাসিচাপা মুখে আরোহী আর ঈশান অভিজ্ঞানের চোখের আড়ালে একবার হাত মিলিয়ে নিল। এর মধ্যে অভিজ্ঞানের ফোন বেজে উঠল। দেখল মংলু ফোন করছে। ওরা দুজনেই ভাবল নিশ্চয়ই নতুন কোনো ক্লু এসেছে। ওদের উত্তেজনায় জল ঢেলে দিয়ে অভিজ্ঞান ফোন নিয়ে স্টাডির বাইরে চলে গেলেন। এসে জানালেন, — সাংসদ শৈলজা মিত্র আজকে তিনদিন হল নিখোঁজ।

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল ওরা — কীহ্

— হ্যাঁ, আমি টিমকে একবার খোঁজ খবর নিতে বলেছিলাম সেনাবাহিনির বিভিন্ন পদে আছে এরকম কে বা কারা রাজ্যের বাইরে আছেন এবং কেমন আছেন? তো জানাল ডিফেন্সের ব্যাপারে খোঁজখবর করতে গিয়ে ওরা আর-একটা খবর জানতে পেরেছে সাংসদ শৈলজা মিত্র ওঁর সেফগার্ডদের বলেছিলেন দুদিনের জন্য একটু একা ঘুরতে যাচ্ছেন, তাই কেউ যেন বিরক্ত না করে। গতবছর ওর স্বামী মারা যাওয়ার পর থেকে ভদ্রমহিলা একাই থাকতেন রাসবিহারীর বাড়িতে। পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে ওর মেয়ে অস্ট্রেলিয়া থেকে জানায়, মায়ের সঙ্গে শেষ কথা হয়েছিল দিন পাঁচেক আগে, মানে নিখোঁজ হওয়ার দুদিন আগে। তখন নাকি শৈলজা মেয়েকে বলেছিলেন, পুজোর আগে কয়েকটা দিন একটু বিশ্রাম নিতে চান। সহকারীকেও বলে গেছিলেন ওকে যেন কেউ বিরক্ত না করে।

আরোহী ঈশানের দিকে তাকাল। কাল আরোহী বলেছিল এটা যদি কোনো বাইরের শত্রুর কাজ হয় তাহলে প্রভাবশালী কাউকে টার্গেট করবে। আজকে তো দেখা যাচ্ছে তাই হয়েছে। ও দম নিয়ে বলল,

— স্যার! সরি অভিদা, প্রথমে সেনা সুরভি সাউ তারপর পুলিশ তনয়া মজুমদার, এখন সাংসদ শৈলজা মিত্র! রাজ্যের বিরোধী দলের কোনো কাজ নয় তো?

ঈশান হাত নাড়াতে নাড়াতে বলল, — পুলিশ, সেনা, সাংসদ কেমন যেন রাজনৈতিক দিকে ঘুরে যাচ্ছে না কেসটা?

অভিজ্ঞান বললেন, — বিরোধী দলের ব্যক্তিগত আক্রোশের ফলাফল বলতে চাইছিস? কিন্তু তাহলেও যারা নিখোঁজ হচ্ছে তারা কোথায়? মারা গেলেও লাশ উদ্ধার তো করতে হবে।

৯

আরোহীর এতদিন সময়ই হয়নি পুজোর জামাকাপড় নিয়ে মাথা ঘামানোর। গত এক সপ্তাহ ও রোজ কলেজ থেকে অভিদার বাড়ি গেছে। সাইকোলজি ও জানে মোটামুটি। এবার ক্রিমিনোলজি আর ভিক্টিমোলজির অ আ ক খ শিখেছে। রিটেন আর ভাইভা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তবে ও দম ফেলেছে। কলেজ থেকে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট এনে জমা দিয়েছে। এখন রোজ সকালে লালবাজার আর বিকেলে অভিদার বাড়ি যায় ও। কেস ফাইল ঘেঁটে দেখবে কী, একে তো ও ইন্টার্ন, তার ওপর জুনিয়র, হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টে কেউ পাত্তাই দেয় না তেমন। এই সপ্তাহটা একরকম জেরবার হয়ে যাচ্ছিল আরোহী। আজকে রোববার বলে জেম্মা আর দিদি ওকে আটকে দিয়েছে। অভিদার বাড়ি গেলে ঈশানকে বলত, কিন্তু বাসবী ওকে বেরোতেই দেয়নি। সেদিন বুটিক থেকে ওর জন্য আনা জামাটা এখন ওকে পরে দেখতে বলেছে বাসবী। পরে দেখল জামাটা আরুর ছোটো হচ্ছে। বাসবী বলল,

— চল পালটে নিয়ে আসি। কাল থেকে তুই আবার ব্যস্ত হয়ে যাবি। তুইও সঙ্গে চল। ওখানেই পরে দেখে নিয়ে আসবি।

— রোববার খোলা থাকে?

— হ্যাঁ রে! মিসেস বাসু বলেছিলেন ওরা বৃহস্পতিবার বন্ধ রাখে। আজকে খোলা। চল।

— আচ্ছা চল।

অনেকদিন পর দুইবোনে বেরোল। ওরা অবশ্য বোনের থেকে বন্ধু বেশি। মেট্রোতে এসপ্লানেডে নেমে আরোহী বায়না ধরল,

— হাওয়াই মিঠাই খাব।

— আগে জামাটা পালটে আসি চল। ফেরার সময় খাব।

— ওক্কে দিদিভাই, চলুন!

— এই আরু, নিখোঁজ মেয়েগুলোর কোনো খোঁজ পেলি তোরা?

— ধুস! আমাকে তো ঠিক করে ফাইলই দেখতে দেয় না মি.বড়ুয়া। শুধু চেয়ারে বসে বসে কান খোঁচাবে আর ফাইল চাইলেই কী চাই, কেন চাই, কোন কেস, কে ভিক্টিম হাজারটা প্রশ্ন! আমার কাজ নাকি কী হচ্ছে না হচ্ছে শুধু দেখে যাওয়া। ফাইলে হাত দেওয়া নাকি আমার কম্মো নয়। এরকম করলে মন খুলে কাজ করা যায় বলতো?

— আহা রে! এরকম করে নাকি?

— আরও শুনবি? ফাইল দিলেও ওঁর সামনে বসে দেখতে হবে যা দেখার। এবার কিছু দেখে আমার চোখ কুঁচকে গেলেই আবার প্রশ্ন— কী দেখলেন? বুঝতে পারছেন না? কী করে বুঝবেন? এই ফিল্ডের লোক তো নন। মজা দেখতে এসেছেন। দেখে যান।

— এ বাবা! তোর অভিদাকে কিছু জানাসনি?

— অভিদা ভালোই জানে বড়ুয়া কেমন লোক! আমাকে প্রথমদিনই বলে দিয়েছে, আমি রাস্তা দেখিয়ে দিলাম। এবার সেই রাস্তায় কীভাবে হাঁটলে হোঁচট কম খাবি সেটা তোর মাথাব্যথা।

কথা বলতে বলতে ওরা মিসেস বাসুর বুটিক হাউসের সামনে এসে গেল। ভেতরে ঢুকে জানা গেল মিসেস বাসু দোকানে নেই। ওঁকে কখন পাওয়া যাবে জিজ্ঞেস করলে হাউসের মেয়েটি বলল, — ম্যাম গত একসপ্তাহ ধরে আসছেন না। ওঁর ফোনও বন্ধ বলছে।

আরোহীর কেমন যেন বেশি শীত করছে। সেটা এই বুটিকের এসির জন্য, না মিসেস বাসু ওদের কেসের পরের ঘুঁটি সেটা আন্দাজ করে, বুঝতে পারল না। একপ্রকার কাঁপতে কাঁপতে ও জিজ্ঞেস করল, — আপনাদের ম্যামের সঙ্গে যোগাযোগ করার আর কোনো উপায় নেই? মানে ওঁর পরিবারের আর কেউ? একসপ্তাহ ধরে ওঁর কোনো খোঁজই করেননি?

মেয়েটা আমতা আমতা করে বলল, — আসলে ম্যাম তো ডিভোর্সি। কলকাতায় আমি ম্যামের সঙ্গে কাজ করছি মাস ছয়েক হল। আগে উনি হায়দরাবাদেই ছিলেন। বলছিলেনও পুজোয় ঘুরে আসবেন হায়দরাবাদ থেকে। তাই ফোনে না পেয়ে চিন্তা হচ্ছিল, কিন্তু মাথায় কাজ করছিল যে ম্যাম হয়তো হায়দরাবাদেই গেছেন।

গলা শক্ত করে আরোহী বলল, — হায়দরাবাদে বৈজয়ন্তী বুটিকের ঠিকানাটা আমাদের দরকার। আর আপনার উচিত থানায় একটা মিসিং ডায়ারি করা।

মেয়েটি থানা শুনে একটু ভয় পেয়ে গেলে আরোহী আবার বলল,— দেখুন বলা তো যায় না বিপদ কখন আসে। আপনার ম্যামের সেফটির জন্যই বলছি ডায়ারিটা করে রাখুন। তাতে পরবর্তীতে আপনারই কম ঝামেলা হবে।

বাসবী অবাক হয়ে বোনের কথা বলার কায়দা দেখছিল। এই কায়দাগুলো আরোহী অভিদাকে দেখে দেখে রপ্ত করেছে। জামাটা পালটে নিয়ে ওরা বুটিক হাউস থেকে বেরিয়ে গেল। কিন্তু আরোহীর মাথায় মিসেস বাসুকে নিয়ে দুশ্চিন্তা ঢুকে গেছে। ওর আর হাওয়াই মিঠাই খাওয়া হল না।

১০

ক্যাম্পে ফিরেই ফোনটা নিয়ে মেসেজ করতে শুরু করে সুরভি। সোশাল মিডিয়ায় খুব একটা যাতায়াত নেই ওর, কিন্তু ইদানীং একটা নাম খুব টানে ওকে। সুরভি জানে, মিশন সেরে ফিরতে যতই দেরি হোক, একজন ওর জন্য অপেক্ষা করে থাকে। সে ওর বাড়ির কেউ নয়। বরং বাবা মা-র পরে এমন কেউ, যাকে নিয়ে ভাবতে ওর ভালো লাগে। নেটওয়ার্কের আওতায় থেকে ও নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় ঢুকে নির্দিষ্ট মানুষটাকে লিখল,

— জেগে আছ?

ওপাশ থেকে উত্তর এল,

— তোমার অপেক্ষায়।

— আর বেশিদিন অপেক্ষা করাব না। আমি ফিরছি।

— তাই! কবে, বলো কবে?

— এই ভ্যালেন্টাইন ডে-তে।

— সিরিয়াসলি বলছ? তুমি আসবে?

— কেন! বিশ্বাস হচ্ছে না ?

— আসলে ভাবতে পারছি না! তোমাকে সামনে থেকে দেখব! আচ্ছা আমার সঙ্গে দেখা করবে তো তুমি?

— এ কেমন কথা! আমার শহরে ফেরার অন্যতম কারণ তুমি। জানো না?

— জানি। এজন্যই অপেক্ষা করে থাকি। এসো। তুমি এলে আমার আয়ু বেড়ে যাবে সুরভি।

— যাহ্!

— তুমি আমার অক্সিজেন।

— আচ্ছা এখন ঘুমোতে হবে। আবার কাল কথা বলব। গুডবাই!

— গুডনাইট!

ফোনটা রেখে নিজের জায়গায় ফিরে এল সুরভি। সবাই প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছে। কী মনে হতে, ফোনের টর্চ জ্বেলে নিজের ডায়ারিটা বের করে বসল।

১১

বাড়ি ফিরে আরোহী দেখে, জেঠু আর জেম্মা বসে টিভিতে খবর দেখছে। খবরে আজকাল 'ক' নিয়েই বেশি কথা হয়। করোনা, কোভিড আর এটা কোরো না, ওটা কোরো না নিয়েই সচেতনতা বাড়ানোর প্রয়াস চলছে। তবে আজকে ফলাও করে সাংসদ শৈলজা মিত্রের নিখোঁজ হওয়ার কথা বলা হচ্ছে। ঘরে ঢুকে ও অভিদাকে আর ঈশানকে কনফারেন্স কলে নিয়ে বুটিক হাউসের মালকিন বৈজয়ন্তী বাসুর ব্যাপারটা বলল। অভিদার থেকে জানতে পারল, সাংসদ শৈলজা মিত্রের বাড়ি থেকে থানায় মিসিং ডায়ারি করা হয়েছে। এরপর থেকেই খবরে বারবার দেখানো হচ্ছে।

ফোনটা রেখে অভিজ্ঞান দ্রুত পান্ডেকে ফোন করে বৈজয়ন্তী বাসুর কথা বললেন। হায়দরাবাদের বুটিক হাউসের ঠিকানা দিয়ে বললেন শীঘ্রই হায়দরাবাদ পুলিশকে খোঁজখবর নিতে। সত্যি কথা বলতে, এই কদিন তনয়া ও সুরভির পরিবারের সঙ্গে কথা বলে তেমন কোনো ক্লু পাওয়া যায়নি। শৈলজা মিত্রের কেসটা মিডিয়ায় চাউর হওয়ার পর থেকে রাজ্যের ওপরমহল থেকেও চাপ আসছে। আজকে সকালেই পান্ডে অভিজ্ঞানকে বলছিলেন,

— বুঝলে ভায়া, সাংসদ নিখোঁজ হওয়ার পর থেকেই যেন তনয়া মজুমদার ও সুরভি সাউয়ের কেসটার গুরুত্ব বেড়ে গেল। সুরভির পরিবারের লোকজন তো অবাক হচ্ছেন এতদিন পর জিজ্ঞাসাবাদের ঘটা দেখে।

বিদ্রূপের হাসি হেসে অভিজ্ঞান বলেছিলেন,

— তাহলেই বোঝো! দুজন নিরাপত্তাকর্মীর নিখোঁজের খবর মিডিয়ার সামনে পৌঁছাতে একজন সাংসদকে নিখোঁজ হতে হল! নয়তো তো মিডিয়া প্রপার অ্যাটেনশানই দিচ্ছিল না। এখন নিখোঁজ সাংসদের খবরে লিঙ্ক হিসেবে সুরভি এবং তনয়ার নাম দেখানো হচ্ছে। কী আজগুবি পরিস্থিতি হ্যাঁ !

— দুঃখজনক হলেও সত্যি।

— তবে এই মিডিয়ার দৌলতে খারাপ, ভালো দুটোই হল পান্ডে।

— কীরকম?

— খারাপ হল, আসল অপরাধী বুঝে গেল আমরা ওর ভিক্টিমদের নিখোঁজ হওয়ার খবর পেয়ে গেছি, তাই অপরাধী এবার খেলা ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে। আর ভালো হল, ধরা না পড়ার চেষ্টা করতে করতে ও অতি সাবধানতাবশত কোনো ভুল করে ফেলতে পারে। সেটাই আমাদের কাজে লাগাতে হবে।

— হুমম! প্রথম দুজনের সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যাকাউন্টগুলো ডিঅ্যাক্টিভেট দেখাচ্ছে। ফোনগুলোও সম্ভবত সিম-সমেত ডেস্ট্রয় করে দিয়েছে। মেয়েগুলোকে নিয়ে কী করছে? রেপ বা মার্ডার হলে শহরের যে-কোনো জায়গায় লাশ তো পাওয়া যাবে!

— তোমার কোনো হাঞ্চ আছে?

— মুখার্জি, আমার মনে হচ্ছে সামনে ভোট আসছে। এটা অপোনেন্ট পার্টির কোনো শত্রুতা বা দলের গট আপ কেসও হতে পারে। মেয়েদের হয়তো কিডন্যাপ করে রাখা হয়েছে।

— মানতাম। কিন্তু সুরভির ব্যাপারটা ধরলে সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। ডিসেম্বর মাস থেকে কিডন্যাপ হয়ে থাকবে সেনাবাহিনীর একজন ট্রেইনড সদস্য! এত স্কিল ওর জানা, কোনো না কোনোভাবে বেরিয়ে আসতে কি পারত না? এমনকি ওর এবং বাকিদের বাড়ির লোকও বলছে কোনো থ্রেটকল বা মুক্তিপণ চেয়ে ফোন যায়নি। তাহলে মোটিভটা কী? শুধুই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব?

— খোঁজ নিয়ে দেখি কোনো রাঘব বোয়াল আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে কিনা! ঝক্কির তো শেষ নেই ভায়া!

— হ্যাঁ। এটা করতে পারো। পুরোনো কোনো মামা যদি ধামা থেকে বেরিয়ে এসে ডিফেন্সের অবস্থা সঙ্গিন করতে চায় তাহলে...

পান্ডের সঙ্গে লালবাজারে বসে কথা হওয়ার পর অভিজ্ঞানের মনে হচ্ছিল ডিফেন্সকে টার্গেট করে খুনি হয়তো পলিটিক্যাল কোনো ফিগারকে শেষ করার প্ল্যান করছে। একটা সুতো ধরার চেষ্টা করছিল সারাদিন ধরে। সারাদিন পরে আরোহীর ফোনে বৈজয়ন্তী বাসুর খবরটা শুনে ওর ওই সুতোটাও ফসকে গেল। বুঝতে পারছে না কোনদিক দিয়ে ভাববে এখন! মনেপ্রাণে চাইছে, হায়দরাবাদে যেন বৈজয়ন্তী বাসুকে সুস্থ অবস্থায় পাওয়া যায়। কিন্তু ওর চাওয়াকে ভুল প্রমাণ করে মংলু ফোন করে জানায়,

— বৈজয়ন্তী বাসু হায়দরাবাদে যানইনি। সাতদিন আগে সন্ধেবেলায় এসপ্লানেডের মেট্রোতে ওকে শেষবার দেখা যায়।

রাতের দিকে পান্ডেও জানায় হায়দরাবাদ পুলিশ থেকে জানানো হয়েছে, বৈজয়ন্তী বাসুকে হায়দরাবাদে দেখা গেছিল প্রায় ছয়মাস আগে। অভিজ্ঞান কী মনে হতে জিজ্ঞেস করলেন,

— আচ্ছা, মিসেস বাসু শুনেছি ডিভোর্সি। ওর এক্স-হাজবেন্ডের সঙ্গে বা ওর ফ্যামিলির অন্য কারও সঙ্গে ডিফেন্সের কোনো যোগ আছে কি?

— এই প্রশ্নটা আমি শুরুতেই করেছিলাম। কিন্তু সেরকম কেউ নেই মিসেস বাসুর ফ্যামিলিতে। ওর এক্স হাসবেন্ড এখন বিয়ে করে এক ছেলে নিয়ে মুম্বইতে সেট্‌লড। আইটি'তে আছে।

— ডিভোর্সের কারণ?

— চাইল্ড ইসু। বৈজয়ন্তী বাচ্চা চাননি। বুটিক হাউস শুরু করতে চেয়েছিলেন। সারাদিন কাপড়ের রং, নকশা নিয়েই থাকতেন। দূরত্ব বাড়তে বাড়তে তারপর

বিচ্ছেদ। তবে এই 'বৈজয়ন্তী বুটিকের' আন্ডারে অনেক মেয়েরা কাজ করছে। বিচ্ছেদের পর এই সাতবছরে কলকাতা, হায়দরাবাদসহ মোট ছটা রাজ্যে ওদের আউটলেট আছে।

— রি-ম্যারেজের কথা ভাবেননি বলছ?

— না। সেরকম কিছু তো শুনলাম না। শুরু থেকেই বুটিক নিয়ে বেশ সিরিয়াস ছিলেন

— হুমম, ঠিক আছে পান্ডে।

ভাবতে ভাবতে মাথার চুল খামচে ধরল অভিজ্ঞান। ওর এখন চিনি ছাড়া কালো কফি লাগবে। রান্নাঘর থেকে কফি বানিয়ে নীচের স্টাডিতে এসে বসল। ঘটনাগুলো না সাজালে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। সাজিয়ে দেখলে যদি কিছু বোঝা যায়! হাতের নখ খেতে খেতে ওর মনে হল আগে কফিটা খাওয়া দরকার। মাথাটা পরিষ্কার হবে।

১২

সকালে বাসবীর ঘুম ভাঙল শাশ্বতর ফোন পেয়ে। আর যা শুনল তাতে ও রীতিমতো ভয় পেয়ে গেল। ওদের কলেজের বাণীম্যাম আর-একটা কলেজের সেমিনারে বক্তৃতা দিতে গেছিলেন কাল। সেখানে ইউনিয়নের ছাত্রদের মধ্যে ঝামেলা চলতে চলতে এক পর্যায়ে ভাঙচুর শুরু হয়। খোলা মাঠের মধ্যে মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে বাণীশ্রী গুহ ওঁর বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, এমন সময় একটা ইটের টুকরো ম্যামের মাথায় লাগে। ম্যামকে তড়িঘড়ি কলেজের মেডিক্যাল রুমে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু এরপর থেকে ম্যামকে আর পাওয়া যাচ্ছে না। কাল নিজের বাড়ি ফেরেননি ম্যাম। শাশ্বত বারবার ফোন করে যাচ্ছে কিন্তু নম্বরটা সুইচ অফ বলছে। আরোহী কেসের কথা বাসবীর সঙ্গে আলোচনা করে তাই ম্যামের কথা শুনে বাসবী তাড়াতাড়ি আরোহীকে ডেকে তুলল। ঘুম ভেঙেই দিদির কাছে সব শুনে আরোহী একটু সময় নিল সবটা বুঝে উঠতে। তারপর অভিদাকে আর ঈশানকে সবটা বলল। অভিদা ঈশানকে বলল, আজকে হাইকোর্টে যেতে না। আরোহীরও লালবাজার গিয়ে কাজ নেই। ওরা যেন সল্টলেকে চলে আসে। বসে আলোচনা করা দরকার। কিন্তু আরোহীর আজকে কলেজে প্র্যাকটিক্যাল আছে। কলেজ থেকে এনওসি দেওয়ার সময় ওকে বলেছিল প্র্যাকটিক্যাল ঠিক সময়ে গিয়ে করতে। আরোহী অভিদাকে বলল, তিনটের আগে ঢুকতে পারবে না। ওর কথা শুনে ঈশান বলল আমিও তাহলে কয়েকটা জরুরি মেল করে ওর সঙ্গেই ঢুকি? অভিজ্ঞান সায় দিয়ে কাকে যেন কল করে পাঠাতে বললেন জানুয়ারি থেকে আগস্ট অবধি সব মাসের প্রতিদিনের কাগজ।

আরোহী হাতমুখ ধুয়ে জলখাবার খেতে খেতে বাসবীকে বলল, বাণীশ্রী গুহর ফ্যামিলি সম্পর্কে যা যা ও জানে, ফ্যামিলি মেম্বারের নম্বর সব জোগাড় করে ওকে দিতে। তারপর স্নান সেরে ও কলেজে চলে গেল।

কাজ করতে করতে অভিজ্ঞান বুঝতেই পারেনি কখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। বেলা তিনটে নাগাদ স্টাডির দরজা ঠেলে আরোহী আর ঈশান ঢুকে এসে দেখে, স্টাডি-টেবিলের ওপর খবরের কাগজের কাটিং ছড়িয়ে রেখে তার ওপর ঝুঁকে রয়েছে অভিদা। ওরা গিয়ে চেয়ার টেনে বসলে অভিদা জিজ্ঞেস করল, — কিছু বুঝতে পারছিস?

ঈশান বলল, — ইদানীং কলেজে ছাত্র ইউনিয়নের মধ্যে বেশ ঝামেলা চলছে। পুজোর পর ভোট জানি, কিন্তু এই ঝামেলাটা প্রতিবারের মতো নয়। কেমন যেন চাপা অসন্তোষ।

আরোহী মাথা নেড়ে বলল,

— কলেজ ইউনিয়নগুলোর হঠাৎ হল কী? বাইরের কারও মদতে এরকম হচ্ছে না তো? যার শিকার কালকে প্রফেসর বাণীশ্রী গুহর নিখোঁজ হওয়া...

অভিদা উঠে বোর্ডের দিকে এগিয়ে গেল। ঈশানরা দেখল সেখানে একটা হাতে আঁকা চার্ট করেছে অভিদা,

	নাম	পেশা	লাস্ট লোকেশন
১।	সুরভি সাউ	সেনা	কলকাতা স্টেশন
২।	তনয়া মজুমদার	পুলিশ	শিয়ালদহ
৩।	শৈলজা মিত্র	সাংসদ	বেহালা
৪।	বৈজয়ন্তী বাসু	বুটিকের মালকিন	এসপ্লানেড মেট্রো
৫।	বাণীশ্রী গুহ	প্রফেসর	মানিকতলা

অভিদা বলতে শুরু করল, — প্রথম তিনজন স্পেশালি শৈলজা মিত্রের ঘটনাটার পর থেকে আমাদের মনে হয়েছিল, বিরোধী পার্টির কেউ কাজগুলো করছে। কিডন্যাপ ধরেই এগোচ্ছিলাম, কিন্তু স্ট্রং কোনো মোটিভ পাচ্ছিলাম না কিডন্যাপের পেছনে। ইনফ্যাক্ট, তোরা জানিস কিনা জানি না, গতবছর ডিসেম্বরে পার্কস্ট্রিটে শৈলজা মিত্রের দলের ছেলেদের সঙ্গে পুলিশের হাতাহাতি চলেছিল। ওদের কেসটা সৎভাবে হ্যান্ডেল করেছিলেন পুলিশ অফিসার তনয়া মজুমদার। এরপরেই জানুয়ারিতে তনয়া মিসিং। আমি সোর্সকে জানতে বলেছিলাম ওই ছেলেগুলো এখন কোথায় আছে, কী করছে? সোর্স বলছে ওরা এখনও জেলে আছে, তবে শৈলজা মিত্র নিজেই মিসিং।

ঈশান বলল, — তাহলে হতেও তো পারে, শৈলজা মিত্র প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এবং দলের ছেলেদের দলে ফিরিয়ে আনার জন্য তনয়াকে সরিয়ে দিতে চেয়েছে! তারপর এখন নিজেই ফেরার!

আরোহী মাথা নেড়ে বলল, — কিন্তু তাহলে সুরভি সাউয়ের কেসটা কী হল? বা এখন বৈজয়ন্তী বাসু এবং বাণীশ্রী গুহ ওঁরা তো সাধারণ জনগণ।

অভিদাও বলল, — হ্যাঁ, শৈলজা মিত্রর পর বৈজয়ন্তী বাসুর খবরটা পেলাম। কলকাতায় ওর পরিচিত বলতে বুটিকের ওয়ার্কাররা। ফ্যামিলি পুরোটাই হায়দরাবাদে। তাহলে যে মোটিভে সুরভি, তনয়া, শৈলজাকে নিখোঁজ হতে হল সেই একই মোটিভে বৈজয়ন্তী বাসু বা বাণীশ্রী গুহকে কেন নিখোঁজ হতে হবে?

আরোহী বলল, — খটকা তো এখানেই অভিদা! প্রফেসর বাণীশ্রী গুহর কাছে ডিসার্টেশন করছিল আমার দিদি। ওর থেকে খোঁজ নিয়ে জেনেছি, ডক্টর গুহর পরিবার আমাদের মতোই খুব সাধারণ। ওঁর বর হোমিয়োপ্যাথ ডাক্তার আর ছেলে একটা ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে ক্লাস টুয়েলভে পড়ছে। মিসেস গুহর কোনো খোঁজ না পেয়ে ওঁর বর ভদ্রলোক থানায় ডায়ারি করতে চেয়েছিলেন।

— কিন্তু তিনদিন না হলে তো ডায়ারি করা যায় না !

— এজন্যই তো করতে পারেনি ঈশান। আমার তো এখন মনে হচ্ছে আমরা হয়তো ঠিক রাস্তায় ভাবছিই না। অন্যভাবে ভাবতে হবে।

অভিদা এবার বলল, — এত খটকার মধ্যেও এটা মোটামুটি কনফার্ম যে খুনি কলকাতাতেই আছে।

ঈশান অবাক হয়ে বলল, — এরকম বলছ কেন?

— ভিক্টিমদের লাস্ট লোকেশনগুলো খেয়াল করে দেখ, কলকাতার আশেপাশে। সুরভির সেদিন বাড়ি ফেরার কথা ছিল, কিন্তু কলকাতা স্টেশনে নেমে ও বাড়িতে ফোন করে জানায় যে ও শহরে পৌঁছে গেছে। ফোনের লাস্ট লোকেশান কলকাতা স্টেশনই দেখাচ্ছে। তারপর থেকে ফোন বন্ধ।

— উবেরের নম্বর বা ড্রাইভারের কিছু?

— না রে, নম্বরটা দেখা যায়নি। তনয়া মজুমদারও সেদিন ছুটি কাটিয়ে শান্তিনিকেতন থেকে ফিরছিলেন। শিয়ালদহ স্টেশন থেকে বেরোতে দেখা গেছে লাস্ট। তারপর আর খোঁজ নেই। শৈলজা মিত্রের প্রাইভেট কারের ড্রাইভারকে জেরা করে জানা গেছে নিখোঁজ হওয়ার দিন শৈলজা বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন, কিন্তু টালিগঞ্জ মেট্রোর সামনে গাড়ি থামিয়ে নেমে যান আর ড্রাইভারকে বলেন গাড়ি নিয়ে চলে যেতে। ফোন কিন্তু তখন সুইচ অফ ছিল।

— তাহলে টালিগঞ্জ নেমে যাওয়াটা ওর আগেই প্ল্যান ছিল?

— তাই তো মনে হয়।

— আচ্ছা বৈজয়ন্তী বাসুকেও শেষ দেখা গেছিল এসপ্লানেড মেট্রো স্টেশনে আর বাণীশ্রী গুহ তো কালকে কলেজ থেকেই...

— কলেজের সিসি ক্যামেরা থেকেও কিছু পাওয়া যায়নি জানিস! বাণীশ্রী গুহ সিকরুমে গেছিলেন মাথায় চোট লেগেছিল বলে। আর ওই কলেজে সিকরুমের সামনে কোনো সিসি ক্যামেরা নেই।

— এখন তো মনে হচ্ছে খুনি সেটা আগে থেকেই জানত। কলকাতায় খুনি আছে আর আমাদের সামনে দিয়ে একজন একজন করে উধাও হয়ে যাচ্ছে!

আরোহী প্রশ্ন করল, — কলকাতায় এরকম কাজ কে করতে পারে অভিদা?

— ভালো করে বোঝার জন্যই আমি খবরের কাগজগুলো আনিয়েছি।

— কী মনে হচ্ছে?

— সেটা বলার জন্যই তো এখানে ডাকা...

১৩

বাসবী শাশ্বতকে ফোন করে কথা বলল কিছুক্ষণ। বাণীম্যামের ঘটনাটার পর থেকে ও কেমন মুষড়ে পড়েছে। ওকে বাড়ি চলে যেতে বললেও যায়নি। বাড়ি গিয়েও তো আনন্দ করতে পারবে না, তাই ম্যামকে না পাওয়া অবধি কলকাতায় থাকবে বলছে। বাসবীর মনে হয়েছিল, বাড়িতে গেলে ওর মনটা একটু ভালো লাগবে। ওরা বন্ধুরা সবাই জানে, বাণীম্যাম শাশ্বতর মায়ের মতো ছিলেন। বর্ধমান থেকে আসা শাশ্বত প্রথম প্রথম বেশ নার্ভাস ছিল একদল শহুরে ছেলেমেয়েদের মধ্যে। কেমিস্ট্রি পড়তে পড়তে, ক্যান্টিনে বসে আড্ডা দিতে দিতে কখন যে ওর সঙ্গে কেমিস্ট্রিটা জমে উঠেছে টেরই পায়নি বাসবী। আজ শাশ্বতর অসহায় অবস্থা দেখে ওরও কষ্ট হচ্ছে। বাণীম্যামের জন্যও খুব খারাপ লাগছে। কী যে করবে ও! শাশ্বতকে বলল, — চল একটু ঘুরে আসি কোথাও থেকে।

— না আমি ঠিক আছি। আমাকে নিয়ে ভেবো না বাসবী।

শাশ্বত হঠাৎ 'তুমি' বলল! ও কি মন বেশি খারাপ থাকলে তুমি করে বলে? হবে হয়তো!

— তোকে নিয়ে ভাবছি না। এমনিই ভাবছি একটু কুমোরটুলি থেকে ঘুরে আসি। যাবি?

— আর-একদিন যাই?

— আচ্ছা কাল তো রবিবার। আরোহীরও ছুটি আছে। কালকে ওকেও নিয়ে যাই আমাদের সঙ্গে?

— আরোহী আমাকে চেনে?

— তোর কথা বলেছি ওকে। কাল আলাপ করে নিস।

— আচ্ছা কাল কখন যাবি জানাস।

আরু কখন ফিরবে জানার জন্য বাসবী ওকে ফোন করল, কিন্তু আরোহী তখন মন দিয়ে অভিদার কথা শুনছে। অভিদা জিজ্ঞেস করল, — ছাত্রনেতা রাজন ব্যাপারীর নাম শুনেছিস তোরা?

ঈশান একটু মনে করে বলল, — সাইকো রাজন? হ্যাঁ ওকে নিয়ে কেস চলছিল না? কলেজের মেয়েদের রেপ করে পা-দুটো কেটে রেখে দিত আর বাকি দেহ ফর্মালডিহাইডে ডুবিয়ে গলিয়ে দিত যে...

আরোহী বলল, — হ্যাঁ, রাজন ব্যাপারীর কেসটা তো পড়ছিলাম ফাইলে। ও ফেটিশিজমের শিকার ছিল। যে মেয়েদের পারফিউমের গন্ধ ওর ভালো লাগত তাদের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ত। তারপর ঘনিষ্ঠতা শেষে ওদের পা কেটে রেখে দিত। ধরা পড়ার পর পুলিশ ওর ঘরের ফ্রিজ থেকে তিনজোড়া পা উদ্ধার করেছিল। কিন্তু ওর তো ফাঁসি হয়ে গেছে না?

— হ্যাঁ। কিন্তু ওর এসব বিকৃত কাজে ওকে সাহায্য করত রাজনের ভাই নিলয়। রাজনকে ভিক্টিমের দেহ গলাতে, পা ফ্রিজে রাখতে, আর সব ধরনের কাজে সাহায্য করত নিলয়। কিন্তু ও কাউকে খুন করেনি বলে ওর ফাঁসি হয়নি। সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল। এখন ব্যাপারটা হল এই নিলয় ব্যাপারী মাস ছয়েক হল জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে।

আরোহী-ঈশান দুজনে একসঙ্গে বলল, — কী বলছ?

— হ্যাঁ। ও তো কেমিস্ট ছিল। রাজনকে ফর্মালডিহাইড, অজ্ঞান করার ওষুধ ওই জোগাড় করে দিত। জেলে অসুস্থ মানুষদের টুকটাক ওষুধও দিত। হিতমূলক কাজকর্ম করত বলে ওর সাজা কম হয়। কিন্তু আমি ভাবছি কেসটা হিতে বিপরীত হয়ে গেল না তো!

ঈশান জিজ্ঞেস করল, — আচ্ছা অভিদা, ফেটিশিজম ব্যাপারটা একজ্যাক্টলি কী? কেস ফাইলে পড়েছিলাম যে বিকৃত যৌনতা বা প্যারাফিলিয়ার একটা পার্ট।

— তা তো বটেই। ফেটিশরা মূলত পা বা বডির আলাদা করে কোনো অংশের প্রতি আসক্ত থাকে। নির্দিষ্ট কিছু পারফিউমের গন্ধেও ওদের অর্গ্যাজম হয়। এই যে রাজন ব্যাপারীর ফ্রিজ থেকে তিনজন নারীর পা বেরোল, ওই পা-গুলো দেখে দেখে ও মাস্টারবেট করত। আসক্তি এরকম বিকৃতও হয়।

আরোহীর আজকাল মাঝেমাঝেই মনে হয়, ক্রিমিনাল সাইকোলজিতে ঢুকে ও কোনো ভুল করল কি? এখন আর-একবার চিন্তাটা মাথার মধ্যে খেলে গেল। কিন্তু এই

কেসটা কী ঘটছে সেটা না জেনেও ওর শান্তি নেই। জোরে কয়েকবার শ্বাস নিয়ে ও ঠান্ডা মাথায় জিজ্ঞেস করল, — নিলয় ব্যাপারীও কি ফেটিশ ছিল?

— দ্যাখ, সেরকম কোনো প্রমাণ তখন পাওয়া যায়নি। আর ফেটিশিজম যে ছোঁয়াচে হয় এরকম কোনো রিসার্চ এভিডেন্স এখনও পর্যন্ত নেই। কিন্তু আসক্তি যে ছোঁয়াচে হয় সেটা তো আমরা জানি। তাই নিজের দাদার থেকে এই নেশাটা আয়ত্ত করতেই পারে নিলয়।

— আর সেরকম হলে বডিগুলোকে গায়েব করে দেওয়া কোনো ব্যাপারই না ওর পক্ষে। প্রথমে সিডেটিভ ড্রাগ দিয়ে অজ্ঞান করে তারপর রেপ করে ফুলবডি ফর্মালডিহাইড বা ওই জাতীয় কোনো রাসায়নিক তরলে ডুবিয়ে গলিয়ে দিলেই মিটে গেল। নিখোঁজ মেয়েগুলো তাহলে কর্পূরের মতো উবে যায়।

ঈশান আরোহীর কথা শুনে হাঁ হয়ে গেল। এত ক্যাজুয়ালি কথাগুলো বলছে কী করে মেয়েটা? সাইকোলজি পড়লে বুঝি এরকম কাঠখোট্টা হয়ে যেতে হয়! আরোহী বলে যাচ্ছে, — কিন্তু তাহলেও একটা খটকা তো থেকেই যায় অভিদা। সুরভি সাউ থেকে বাণীশ্রী গুহ এদের সবার সঙ্গে নিলয় ব্যাপারীর কী সম্পর্ক? অ্যাক্সেস করছে কী করে?

অভিদা বলল, — তার থেকেও বড়ো বিষয় মোটিভ কী? আচ্ছা আরোহী তুই বলেছিলি সুরভি এবং তনয়ার সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যাকাউন্ট ডিএক্টিভেট আছে। বাকি তিনজন ভিক্টিমের অ্যাকাউন্ট আছে কিনা চেক করেছিলি?

— হ্যাঁ। ওদের অ্যাকাউন্ট আছে এখনও।

— স্ট্রেঞ্জ!

অভিদার ভাবনায় ছেদ পড়ল ঈশানের প্রশ্নে।

— আচ্ছা এই ফেটিশিজম কেন হয়? মানে মানুষের এই বিকৃত আসক্তি তো স্বাভাবিক না!

— ভালো প্রশ্ন করেছিস। আরোহী তো ফ্রয়েড পড়েছে। এই ফেটিশের ব্যাপারে ফ্রয়েড বলেছে ছোটোবেলায় মা বা মাতৃস্থানীয়া কেউ, মানে মাদার ফিগারের প্রতি কোনো জটিলতা; সেটা ভাবনার স্তরেও হতে পারে, ওটা ওই ছোটো বয়সেই মিটে না গেলে বড়ো হয়ে ছেলে তার ফিমেল পার্টনারের সঙ্গে মিলিত হওয়ার সময় যৌনতাকে বিকৃত রূপ দেয়।

— এরকমও হয় নাকি?

আরোহী ঈশানের দিকে ঘুরে বলল, — আরে ফ্রয়েডের থিয়োরিগুলো এরকমই। একই সঙ্গে অবিশ্বাস্য আর ফ্যাসিনেটিং। তিনি এও বলেছেন, ছেলেবেলায় ছেলে প্রথম আসক্ত হয় মায়ের প্রতি, তাই মাকে ইমপ্রেস করার জন্য সে তার বাবাকে অনুকরণ

করে আর মেয়ে প্রথম আসক্ত হয় বাবার প্রতি, তাই মায়ের মতো আচরণ করে বাবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়।

— অ্যাঁ! মানে এই যে ছেলেরা ছোটোবেলায় বাবার মতো করে চুল আঁচড়ায় সেটা মাকে আর মেয়েরা যে মায়ের মতো টিপ পরে সাজে সেটা বাবাকে ইমপ্রেস করার চেষ্টা?

অভিদা বলল, — হ্যাঁ। এমনকি ফ্রয়েডের এটাও মনে হয়েছে, মায়ের প্রতি আসক্তি থাকার কারণে ছেলে বাবাকে ভয় পেতে শুরু করে। ভাবে, ওর এই আসক্তির কথা জানতে পারলে বাবা ওর পুরুষাঙ্গ কেটে ফেলতে পারে। এই দুশ্চিন্তাকে ফ্রয়েড বলেছেন কাস্ট্রেশন অ্যাংজাইটি। আর এই ফেটিশিজম হচ্ছে কাস্ট্রেশন অ্যাংজাইটিরই একটা ফলাফল। মানে এধরনের অ্যাংজাইটি দমিয়ে রাখলে নাকি সে মানুষ ফেটিশ হতে পারে।

ঈশান ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বলল, — বাপরে! বড়ো হয়ে ফেটিশ হবে, না ব্রিটিশ হবে তার ব্যাখ্যা ছেলেবেলার ঘটনা থেকে দিচ্ছে!

— এটাই তো পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্টের জাদু !

আরোহী খুশি হয়ে বলল, — থ্যাংকইউ অভিদা! ক্রিমিনোলজিতেও ফ্রয়েডের থিয়োরি পাব ভাবিনি। কিন্তু নিলয় ব্যাপারী ফেটিশ হলেও ভিক্টিমদের পাচ্ছে কী করে? ওদেরকেই কেন টার্গেট করল?

— সেটা নিলয় ব্যাপারীকে ধরতে পারলেই জানা যাবে।

— কী করে?

— কাল লালবাজারে আমি এই কেসটার ব্যাপারে জয়েন্ট কমিশনার পান্ডে আর ইনফর্মার মংলুর সঙ্গে একটু বসব। তারপর ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন টিম ওদের অপারেশন শুরু করবে। যদিও নিলয় ব্যাপারীকে দায়ী করছি শুধু হাইপোথিসিসের ভিত্তিতে। কোনো শক্ত প্রমাণ তো নেই। তবে এছাড়া আর উপায়ও নেই। আরোহী, তুই তোর সময় মতো কাল লালবাজারে পৌঁছে আগে রাজন ব্যাপারী আর নিলয় ব্যাপারীর কেস ফাইল স্টাডি করে দেখবি। নিলয় এখন কোথায় ওর আস্তানা গেড়েছে সেটা জানা দরকার।

১৪

শহর থেকে পাঁচজন নারী উধাও। পাঁচজনের ব্যাকগ্রাউন্ড পাঁচ রকমের। এরা নিজেরা একে অন্যকে চিনত কিনা এরকম কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি এখনও। গতবছর ডিসেম্বরে পার্কস্ট্রিটের ঝামেলার পর সাংসদ শৈলজা মিত্র পুলিশ তনয়া মজুমদারকে চিনে থাকতে পারে। নিলয় ব্যাপারী কলেজ জীবনে ছাত্র ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারি ছিল। সেই সূত্রে শৈলজার সঙ্গে ওর পরিচয় থাকতে পারে। ধরে নেওয়া

যায় প্রফেসর বাণীশ্রী গুহকেও নিলয় চিনত। কিন্তু বাকি তিনজনকে? নিলয় ব্যাপারীই এগুলো করছে না অন্য কেউ?

বারবার এপাশ-ওপাশ করতে করতে ঘুমোতে পারলেন না অভিজ্ঞান। বারবার মনে হচ্ছে চোখের সামনে কোনো সূত্র তিনি এড়িয়ে যাচ্ছেন। কী সেটা? বুঝতে পারছেন না।

পরদিন সকালে থানায় অফিসার বড়ুয়ার সামনে বসে কেস ফাইল স্টাডি করছিল আরোহী। বড়ুয়া শ্যেনদৃষ্টিতে ওকে দেখছেন। দরজার বাইরে চায়ের কেটলি নিয়ে মংলু বাজখাঁই গলায় ওকে জিজ্ঞেস করল,

— দিদি চা খাবেন? চা দেব?

আরোহী বিরক্ত হয়ে ওর দিকে তাকালে দেখতে পায় অভিদা মংলুর পাশ দিয়ে জয়েন্ট কমিশনারের ঘরের দিকে যাচ্ছে। বুঝতে পারল ওরও যাওয়ার সময় হয়েছে। হাতের ফাইলটা বড়ুয়াকে জমা দিয়ে ও বেরিয়ে মংলুর সঙ্গে এগিয়ে গেল।

পান্ডের সঙ্গে আরোহী, ঈশানকে আলাপ করিয়ে দিল অভিদা। পান্ডে বিমর্ষ মুখে বললেন,

— ওপরমহল থেকে খুব চাপ আসছে ভায়া। সামনে পুজো, এর মধ্যে এরকম চলতে থাকলে মানুষ ভয় পেয়ে যাবে। এমনিতেই করোনা ভাইরাসের কেসে মানুষ নাজেহাল। তার ওপর আমরা রাজ্যে মহিলাদের নিরাপত্তা দিতে পারছি না! এই ধরনের কথা উঠছে।

— কথা ওঠা তো স্বাভাবিকই। যা সব কাণ্ড ঘটছে! তবে এটা বুঝতে পারছি অপরাধী একজন পুরুষ এবং সে কলকাতাতেই আছে।

ঈশান একটু কেশে অভিদার অনুমতি নিয়ে বলল,

— নিলয় ব্যাপারীর খোঁজ পাওয়া গেছে?

উত্তরটা মংলু দিল, — হ্যাঁ! ভবানীপুরে ও একটা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকত। মাধব বলে এক লোকাল বখা ছেলে (বলতে বলতে মংলু ঈশানকে দেখিয়ে হাত নেড়ে নেড়ে বলে) হ্যাঁ হ্যাঁ তোমার বয়সিই হবে মাধব। ওকে শেল্টার দিয়েছিল আর খাবার পৌঁছে দিত।

অভিজ্ঞান ভাবল, নিলয়ের সঙ্গে শেষে মাধব! এই ঝটকাটাই ওর বাকি ছিল! মংলুকে জিজ্ঞেস করল,

— মাধব দাস? ভবানীপুরের ৮/এ সরণির মুখার্জিবাড়িতে থাকে? মংলু, ওর ছবিটা দেখাও তো!

পান্ডে অবাক হল মাধব লোকটার ঠিকানা বলতে গিয়ে অভিজ্ঞান নিজের বাড়ির ঠিকানা কেন বলল! আরোহী, ঈশানের চোখ গোলগোল হয়ে গেল মংলুকে ওর

তাপ্পিমারা নোংরা পকেট থেকে দামি মডেলের স্মার্টফোন বের করতে দেখে। অভ্যস্ত হাতে ফোন চালিয়ে ও অভিদাকে মাধব দাসের ছবি দেখিয়ে দিল। অভিজ্ঞান বলল,

— ওকে তাড়াতাড়ি জেরা করার ব্যবস্থা করতে হবে। আর ওর থেকে খোঁজ নিয়ে নিলয়কে ধরতে হবে।

পান্ডে অভিজ্ঞানকে মনে করিয়ে দিল,— মুখার্জি, তুমি ক্রিমিনোলজিস্ট। ফিল্ডে গিয়ে কাজ নেই। আমি ক্রাইম ইনভেস্টিগেটিং টিমকে পাঠাচ্ছি।

অভিজ্ঞান মাথা নেড়ে সায় দিলে মংলু ওই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ঈশান যেন এতক্ষণে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। অভিজ্ঞান পান্ডেকে জিজ্ঞেস করলেন,

— আচ্ছা এই মংলু আমাদের সোর্স হয়ে কাজ করছে কতদিন হল?

— তা হল বছর সাতেক। আমি দিল্লি থেকে এখানে জয়েন্ট কমিশনার হয়ে আসা ইস্তক ওকে দেখছি।

— ওর কোনো পাস্ট?

— আছে তো!

পান্ডে একবার আরোহী, ঈশানের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললেন, — বছর দশেক আগে ওকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস করার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। অনেক পরে জানা যায়, যে মেয়েটার বাড়ি থেকে এই অভিযোগ করা হয়, ওর সঙ্গে মংলুর প্রেম ছিল। মংলুর সব টাকা হাতিয়ে নিয়ে, ওকে একপ্রকার দেউলিয়া করে দিয়ে মেয়েটা বড়োলোক বাড়ির বউ হয়ে যায় আর মংলুর নামে কেস ঠুকে দেয়। তখনকার ওসি সাগর সমাদ্দারের স্নেহভাজন ছিল আমাদের মংলু। সমাদ্দারের কাছেই ওর ইনফর্মার হয়ে কাজ করার হাতেখড়ি বলতে পারো।

মংলুর কথা শুনে ঈশান জিজ্ঞেস করে ফেলল, — এর পর থেকেই কি মংলু এরকম খ্যাপা, সরি খ্যাঁচা হয়ে গেছে?

— এর পর থেকে ও সংসারের মোহমায়া ত্যাগ করে কালীভক্ত হয়ে গেছে। পূর্ণিমা, অমাবস্যায় শ্মশানে বসে কালীর ধ্যান করে।

— বলো কী!

— হ্যাঁ, সেরকমই শুনেছি।

পান্ডে ওঁর বন্ধু অভিজ্ঞানকে এবার জিজ্ঞেস করলেন,

— কিন্তু অভি, তুমি মাধব দাসকে কী করে চেনো? তোমার বাড়ির ঠিকানাই তো বলছিলে না তখন?

— হ্যাঁ পান্ডে। আমাদের বাড়ির ড্রাইভার নিতাইকাকার ছেলে মাধব। কলেজে ভরতি হওয়ার পর থেকেই কুসঙ্গে পড়ে যায় ছেলেটা। দুবার ব্যাক পাওয়ার পর আর পড়াশোনা করেনি। ওকে নিয়ে ওর বাবা-মার চিন্তার শেষ নেই। এখন শুনছি ও নাকি নিলয় ব্যাপারীর সঙ্গে ভিড়েছে।

— দেখা যাক। নিলয় ব্যাপারীর সূত্র ধরে যদি কেসটার একটা লিড পাওয়া যায়...

অভিজ্ঞান চিন্তা করতে করতে বললেন,

— না-ও পাওয়া যেতে পারে। নিলয় ব্যাপারী এখানে একটা হাইপোথিসিস মাত্র। শহর থেকে পাঁচজন নারী উধাও, কলেজগুলোতে ছাত্র ইউনিয়নের অস্থির পরিস্থিতি আর এদিকে এখনও আমরা পুরো ধোঁয়াশার মধ্যে রয়েছি।

আরোহী বলল, — শুধু দুটো জিনিস ছাড়া— এক, অপরাধী কলকাতায় আছে আর দুই, অপরাধী একজন পুরুষ, যার মাদার ফিগারের সঙ্গে সমস্যা আছে।

পান্ডে বললেন, — তাহলে শুধু নিলয় ব্যাপারী বা ফেটিশিজম কেন? মায়ের প্রতি বিরূপতা থেকে যারা পরবর্তীকালে ক্রিমিনাল হয়ে গেছে ওদের সবার কেস ফাইল ঘেঁটে ওদের নাড়ি- নক্ষত্র বের করা দরকার তো!

এবার আরোহী ওর ক্ষোভের কথাটা বলল, — কিন্তু সে সুযোগটা আমি পাচ্ছি কোথায় স্যার? মি. বড়ুয়া এরকম নজরবন্দি করে রাখেন যে বলার নয়। ইন্টার্ন বলে আমি নাকি ফাইল হারিয়ে ফেলব, চাবি হারিয়ে ফেলব। এর মধ্যে আমি কাজ করব কী করে? সবার অলক্ষ্যে চাবি নিয়ে সব ফাইল নামিয়ে নিজের মতো করে তো দেখতে পারি না!

পান্ডে হাতের আঙুল দিয়ে টেবিল বাজিয়ে মজার ছলে বললেন,

— না সে তুমি দেখতেই পারো। আমরা সেটা না দেখলেই হল।

আরোহী পাণ্ডে স্যারের কথা ঠিক করে বুঝে ওঠার আগেই ওঁর ফোন বেজে উঠল। ফোনটা ধরে কিছুক্ষণ কথা বলে পান্ডে অভিজ্ঞানকে বললেন, — মাধবকে নিয়ে আসা হচ্ছে। তুমি জেরা করবে?

অভিজ্ঞান লম্বা করে শ্বাস নিয়ে বললেন, — হ্যাঁ। আমিই করব।

১৫

বাড়ি ফিরতে ফিরতে অনেকটা দেরি হয়ে গেল তনয়ার। বউদিকে অবশ্য বলে দিয়েছে, রাতের খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে, শুয়ে পড়তে। ওর জন্য কেউ এভাবে জেগে বসে থাকলে ওর অস্বস্তি হয়। ওর কাজটাই এমন! হাত-মুখ ধুয়ে এসে খেতে বসে ফোনে মেসেজ ঢুকল,

— পৌঁছে গেছিস?

খেতে খেতে বাঁ হাতে টাইপ করতে থাকল তনয়া,

— হ্যাঁ এই তো! হাত-পা ধুয়ে খেতে বসেছি।

— সারাদিন আমার মাথা খেয়ে, লোকের হাত-পা ভেঙে এসে আবার খাচ্ছিস?

— তোর মাথা খাওয়াটা আমার অধিকার। আর আইনের পক্ষে থেকে, অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া আমার কর্তব্য।

— হোয়াট আ ডায়ালগ!
— শাট আপ!
— কবে দেখা করবি?
— আরে ছুটিই পাচ্ছি না! দেখি দাঁড়া!
— আমিই মিস করি। তুই তো পাত্তাই দিস না।
— হ্যাঁ রে! এজন্যই তো সারাদিন ডিউটি করে এসে তোর সঙ্গে কথা বলছি।
— উদ্ধার করেছেন! আমি ধন্য হয়েছি!
— আমি দেখা করে ধন্য হব।
— বাবাহ্ নেক্সট ট্যুর প্ল্যান কী তোর?
— বোলপুর যাব ভাবছি।
— আমিও যাই সঙ্গে?
— খবরদার না! ওখানে গেলে, ফেরার পথে আমিই দেখা করব তোর সঙ্গে।
— পাক্কা?
— পাক্কা!

১৬

বাসবী আরোহীকে বলে দিয়েছিল তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে। ও এলে ওকে নিয়ে কুমোরটুলি যাবে। তাই ঈশান যখন কোর্টে যাবে বলে বেরোল, আরোহীও বেরিয়ে এল বাড়ি যাবে বলে। বড়ো রাস্তায় এসে ঈশান ওকে জিজ্ঞেস করল,

— তুই এখন কোথায় যাবি রে?

— বাড়ি ফিরব। আজকে দিদির সঙ্গে বেরোব একটু। সঙ্গে বাণীশ্রী গুহর প্রিয় ছাত্র শাশ্বতও থাকবে। দেখি কোনো ক্লু পাওয়া যায় কিনা...

— হুমম! কিছু জানতে পারলে জানাস। এই তুই মংলুর কাণ্ডটা দেখলি! ওরকম গবামার্কা পোশাকের পকেট থেকে স্মার্টফোন বের করে ফেলল!

— আরে ও সাতবছর ধরে পুলিশের চরবৃত্তি করছে। ওর নেটওয়ার্কও সেই লেভেলেরই হবে। আজকাল টেকনোলজি না জানলে, ব্যবহার না করলে এরকম নেটওয়ার্ক সামলে চলা সম্ভব? আশ্চর্য কথা বলিস!

— ওমা! অভিদা যে বলল, মংলু কি-প্যাডফোন চালায়...

— অভিদা বলল আর তুইও মেনে নিলি মাথামোটা! মংলু যেরকম পোশাকে ঘুরে বেড়ায় তাতে স্মার্টফোনটা বেমানান, তাই কি-প্যাডফোনটা সবাইকে দেখানোর জন্য আর স্মার্টফোনটা ওর কাজের জন্য।

— ওহ্ হেব্বি ঘোড়েল মানুষ তো মাইরি!

— ঘোড়েল বটে। কিন্তু এই কেসটার থেকে বেশি না।

— তা ঠিক। আমি বলি কী, নিলয়কে ট্রেস করা হোক, ততক্ষণে আমি এই ফেটিশের ক্যাটাগরিতে বা মাদার ফিগার রিলেটেড আর কী কী ডিজঅর্ডার থাকতে পারে সে ব্যাপারে একটু স্টাডি করে রাখি।

— সেরকম সাইকোটিক ডিজঅর্ডারের ডিটেইলস আমি তোকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তুই কোর্টের কেস ফাইল ঘেঁটে দেখিস তো কোনো লিড পাস কিনা।

— বেশ। আসি তাহলে। তুই সাবধানে যাস আর বাড়ি ফিরে একটা টেক্সট করে দিস।

কেসের ঝামেলার মধ্যেও ঈশানের শেষ কথাটা ভালো লেগে গেল আরোহীর।

লালবাজার থেকে বরানগর লম্বা পথ। অন্যসময় হলে আরোহী বাসে ঘুমিয়ে নিত। কিন্তু এখন ভালো করে সাইট ঘেঁটে পড়ে দেখল। চলন্ত বাসে ফোনের স্ক্রিনে চোখ রেখে পড়তে ওর একটু অসুবিধা হচ্ছে, কিন্তু পাত্তা দিল না। কয়েকটা সিনড্রোমের নাম ঈশানকে পাঠিয়ে দিল। বাড়ি ফিরে বাসবীর সঙ্গে বেরোল। কুমোরটুলি পৌঁছাতে পৌঁছাতে অন্তত কুড়িবার বাসবীকে জিজ্ঞেস করল, শাশ্বত ওর শুধু বন্ধু, না বেশি বন্ধু? বাসবী বারবার বলল, এই মুহূর্তে শুধু বন্ধু। শাশ্বত ওদের আগেই পৌঁছে গেছিল। আরোহীর সঙ্গে প্রাথমিক আলাপ সারার পর বাণীম্যামের কেসের আপডেট জিজ্ঞেস করল। বাসবীর সঙ্গে দিনরাত এই কেস নিয়েই আলোচনা চলে আরোহীর। ও জানত, বাণীশ্রী গুহর ঘটনার পর শাশ্বত বেশ ঘেঁটে আছে। আরোহী বলতে যাচ্ছিল, ওরা একটা লিড পেয়েছে, এবার দেখা যাক। কিন্তু বাসবী আরোহীর কাছে যা যা শুনেছে শাশ্বতকে খুলে বলল। আরোহীর একবার মনে হল, এত তাড়াতাড়ি সবটা শাশ্বতকে বলা কি ঠিক হল? পরে যদি সবটাই নিছক অনুমান হয়ে দাঁড়ায়! শাশ্বত ওকে জিজ্ঞেস করল,

— আচ্ছা আরোহী, ফেটিশিজমের দিক দিয়ে ভাবলে তোমাদের কাছে স্ট্রং লিড আছে নিলয় ব্যাপারী। তাহলে আবার অন্যান্য ডিজঅর্ডারের ব্যাপারে কেন ভাবছ? মানে, এতে ফোকাসটা নড়ে যাবে না? ক্রিমিনাল যদি একজন হয়, তাহলে ওর মধ্যে তো একটাই ডিজঅর্ডার থাকবে, তাই না?

— তোমার পয়েন্টটা বুঝতে পারছি। কিন্তু সবসময় একজনের একটাই ডিজঅর্ডার থাকবে এরকম না-ও হতে পারে। যেমন ধরো, যে পেশেন্ট বাইপোলার পার্সোনালিটির শিকার, তার মধ্যে ডিপ্রেশনও থাকতে পারে। আবার সে ম্যানিয়াকও হতে পারে। তবে এটা ঠিকই বলেছ, বেশি অপশন ভাবলে আমরা ফোকাস থেকে দূরে সরে যেতে পারি।

একথা-সেকথা বলতে বলতে ওরা তিনজন কুমোরটুলির রাস্তায় হাঁটতে লাগল। বাসবী, আরোহী পিঠোপিঠি বয়সের, তাই দিদির বন্ধু বলে শাশ্বতকে আর দাদা বলল না ও। বাসবীর সঙ্গে ছেলেটাকে বেশ ভালোই লাগছে আরোহীর। ওদের কয়েকটা ছবি তুলে নিল ও। পরে বাসবীকে খ্যাপানো যাবে ছবিগুলো দিয়ে। এর মধ্যে ঈশান আরোহীকে ফোন করছে দেখে ও সরে গিয়ে ফোনটা ধরল,

— হ্যাঁ ঈশান বল।

— আরোহী, নোটিশ করার মতো তেমন কোনো লিড পেলাম না। তবে আমি আজকে জয়রামস্যারের সঙ্গে আলোচনা করছিলাম। স্যার বললেন, জেল থেকে এখন ছাড়া পেয়েছে এরকম ক্রিমিনালকেই কেন টার্গেট করতে হবে? এরকমও তো হতে পারে যে, ছোটোবেলায় মা বা মাতৃস্থানীয়া কারও ওপর বিরূপ অভিজ্ঞতা হয়ে আজকে সে ক্রিমিনাল বা সিরিয়াল কিলার তৈরি হয়েছে।

— হ্যাঁ! এটা হতেই পারে। নিলয় ব্যাপারীর লিডটা ফেল করলে সেভাবেই ভাবতে হবে। দেখি অভিদা কী বলে।

— হুমম!

ঈশানের সঙ্গে কথা শেষ করে পেছনে ঘুরতেই আরোহী দেখে শাশ্বত ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসছে। হেসেই ওকে জিজ্ঞেস করল,

— কী! নতুন কোনো লিড পেলে নাকি?

আরোহী মাথা নেড়ে বলে,

— না ঠিক লিড নয়। তবে নিলয় ব্যাপারীর হাঞ্চটা কাজ না করলে নতুন করে ভাবার একটা উপায় পেয়েছি। দিদি কোথায় গো?

— তোমাদের বাড়ি থেকে ফোন এসেছে। ও কথা বলছে ওদিকে।

— ওহ্, আমাদের এবার ফেরা উচিত তো!

— হ্যাঁ চলো। তোমার সঙ্গে আলাপ হয়ে খুব ভালো লাগল আরোহী। তোমার মধ্যে একটা শেষ দেখে ছাড়ার স্পিরিট আছে। আমি জানি, তুমি এই কেসটার শেষ পর্যন্ত যাবে।

— সেই চেষ্টাই তো করছি। চলো।

ওরা তিনজন যখন ফেরার পথ ধরল তখন সূর্য ডুবে গেছে। ওরা জানল না, ততক্ষণে অন্ধকার নদীর কালো জলে একটা লাশ ভেসে উঠেছে।

১৭

লালবাজার থানার ইনভেস্টিগেশন রুমে এখন অভিজ্ঞানের মুখোমুখি চেয়ারে বসে রয়েছে মাধব দাস। থানায় এসে ওর অভিদাদাকে দেখার পর থেকেই মাধব ফ্যাঁচফ্যাঁচ

করে কেঁদে যাচ্ছে। অন্যসময় হলে অভিজ্ঞান হয়তো বলত, মেলা কাঁদিসনে মাধব। মন শক্ত কর। কিন্তু এখন নিজের মনকে শক্ত করে অভিজ্ঞান জিজ্ঞেস করলেন,

— কোথায় ছিলি?

মাধব কাঁদতে কাঁদতে বলছে, — পাড়াতেই ছিলাম গো অভিদাদা—

— নিলয় ব্যাপারীর সঙ্গে তোর আলাপ হল কী করে?

— বেল্লিকদাদা রাজনদার পার্টির লোক ছিল কলেজে। আমি এখন বেল্লিকদাদার সঙ্গে থাকি তো! দাদাকে গুরু মানি। গুরু বলল, রাজনের ভাই নিলয়কে শেলটার দিতে হবে। তাই দিয়েছিলাম।

— তোর বেল্লিকদাদাটা কে?

— হারুজেঠুর ছেলে গো অভিদাদা। তোমার থেকে সাইকেল নিতে আসত যে...

মনে পড়েছে অভিজ্ঞানের। হরনাথ মল্লিকের ছেলে অর্জুন মল্লিকের কথা বলছে। হরকাকু ওদের পাশের পাড়ায় থাকতেন। বাবার ভালো বন্ধু ছিলেন। হরকাকুর ছেলে অর্জুন ছোটোবেলায় অভির সাইকেল নিতে আসত। অভিজ্ঞান বিরক্ত হয়ে বললেন,

— ওর নাম তো অর্জুন মল্লিক। বেল্লিক বলছিস কেন?

— আসলে গুরুর মাথায় বেশি ব্রেইন নেই। স্কুলপাশ করার পর আর পড়তে পারেনি গো। হারুজেঠু কত চেষ্টা করেছিল, তাও গুরু পড়তে পারল না। পাড়ার লোক ওকে তখন থেকে 'মল্লিকবাড়ির বেল্লিক ছেলে' বলে ডাকে।

— ও তোর গুরু হল কী করে?

— আমিও স্কুলপাশ করার পর আর পড়তে পারছিলাম না গো দাদা। তখন গুরুর কাছে গিয়ে পড়লাম। গুরুর ফাই-ফরমাশ খেটে দিলে গুরু আমায় বিড়ি-সিগারেট খাওয়ায়...

বলেই নিজের জিভ কামড়ে ফেলে মাধব। অভিদাদাকে বলে ফেলেছে ও বিড়ি-সিগারেট খায়! অভিজ্ঞান ফের প্রশ্ন করলেন, — আর কী করে?

— আর-একটু এর-ওর কাছ থেকে টাকা এনে দিতে বা দিয়ে আসতে বলে। গুরুর একজন বস আছে জানো অভিদাদা। বসই গুরুকে বলেছিল, নিলয়কে শেলটার দিতে।

— নিলয় ব্যাপারী এখন কোথায়?

— বিশ্বাস করো অভিদাদা, আমি জানি না নিলয় কোথায় গেছে। কিচ্ছু বলে যায়নি। অন্য সময় বেরোনোর থাকলে খাবে না যে সেটা বলে যেত। কালীভক্ত ছিল তো, মন্দিরে গেলেও বলে যেত।

— ওর ঘরে কেউ আসা-যাওয়া করত?

— হ্যাঁ। আমি আর গুরু।

— কোনো মহিলাকে ওর ঘরে যেতে দেখেছিস?

— না তো! ওই পাগলের ঘরে কোন মেয়েলোক যাবে!

— পাগল বলছিস কেন?

— ফাঁকা ঘরে একা একা কথা বলত। দেয়ালের দিকে মুখ করে কীসব বকে যেত, জয় মা কালী, কী খেল দেখালি! এসব বলত। হঠাৎ হঠাৎ কেঁদে উঠত মা, মা বলে!

— ওকে শেষবার কখন দেখেছিলি?

— আজকে সকালেই খাবার দিতে গেছিলাম যখন...

— কিছু বলেছিল? মনে করে বল!

— সেরকম কিছু না। বলল, কী এনেছিস দে দেখি! খাওয়া সেরে ঘাটে যাই। ডুব দিয়ে আসি। শুদ্ধ হই।

— ঘাটে গেছে?

— রোজই মায়ের ঘাটে যেত।

— হুমম! অর্জুন, মানে তোর গুরু কী করে এখন?

— একটা স্টেশনারি দোকান দিয়েছে। ওটা চালায় আর দুবেলা পার্টি অফিসে বসে। দলের হয়ে কাজ করে।

অভি মিচকে হেসে বলল, — দলের হয়ে কাজ করে বলতে নেই। বলবি, মানুষের জন্য কাজ করে। জনগণের জন্য বললে আরও ভালো হয়।

মাধবকে জেরা করার মধ্যেই ওর ফোন বেজে উঠল। পান্ডের ফোন দেখে রিসিভ করলেন,

— অভি, নিলয় ব্যাপারী ইজ ডেড।

— কী বলছ!

— আজকে কুমোরটুলি ঘাটে ওর লাশ ভেসে উঠতে দেখা গেছে। জলে ডুবে মৃত্যু। আপাতত মনে হচ্ছে সুইসাইড কেস। পোস্ট-মর্টেমের পর সিয়োর হওয়া যাবে।

পান্ডের কথা শুনতে শুনতে অভিজ্ঞানের মনে হল, ওর ঘুঁটি সাজিয়ে খেলতে বসা দাবার বোর্ডটা খেলা শেষ হওয়ার আগেই কেউ উলটে দিল।

১৮

ইট ভাঙার ঠুকঠাক শব্দ কানে আসছে। কেদারের মনে হয়, মা যখন ইটের টুকরোগুলোকে আরও ছোটো ছোটো টুকরো করে, তখন শুধু ইট না, ইটের সঙ্গে সঙ্গে ওর আর মায়ের স্বপ্নগুলোও খানখান করে ভেঙে দেয়। ইটভাটার পেছনদিকের ঘরটায় মায়ের সঙ্গে কেদার ঘুমায়। মাটিতে বিছানো চাদরে শুয়ে ও দেয়ালের ঘুলঘুলি দিয়ে রাতের আকাশ দেখে আর ভাবে, চাঁদটা কখন হেঁটে হেঁটে ঘুলঘুলির সামনে আসবে! রোজ রাতে ও অপেক্ষা করতে থাকে ঘুলঘুলি দিয়ে চাঁদের আলো দেখার জন্য। একসময়

ঘুমে ওর চোখ বুজে আসে। প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছে, তখনই ঘরের মধ্যে কয়েকজন ঢুকে আসার শব্দে কেদারের ঘুম ছিঁড়ে যায়। পাশে শুয়ে থাকা মায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে লোকগুলো। ভয়ে ও দেয়ালে সিঁটিয়ে বসে থাকে। ওর সামনে ওরা মায়ের ওপর অত্যাচার করে। চোখ বন্ধ করে কেঁদে ওঠে কেদার, কিন্তু ওর কান্না কেউ শুনতে পাচ্ছে না। মাকে অজ্ঞান হয়ে যেতে দেখে কেদার অন্ধকার হাতড়ে জল নিয়ে আসে। ঘরে এসে জলটা মায়ের মুখে দেওয়ার আগেই দেখে মায়ের মাথা থেকে গলগল করে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে মেঝেতে। ঘরে কেউ নেই। শুধু মায়ের রক্তে ভেজা চুলের ওপর একটা ইটের টুকরো থেমে আছে। গলা শুকিয়ে যায় দশ বছরের শিশু কেদারের। ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটতে থাকে। কেন ছুটছে, কোথায় যেতে হবে ও জানে না। পথে কুকুর দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে।

কুকুরের মুখটা দেখতেই ঘুমটা ভেঙে যায়। স্বপ্নের জাল ছিঁড়ে উঠে বসে হাঁপাতে থাকে কেদার। বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে টান দেয়। কিন্তু টানতে পারে না। হড়হড় করে বমি করে ফেলে মেঝেতে। সামনের ঘরে এসে জানালার পর্দা সরিয়ে দেয়। রাতের ফুটপাতে ঘুমন্ত কুকুরের শরীরের ওপর ল্যাম্পপোস্টের ভ্যাপসা আলো এসে পড়ছে। দেখতে দেখতে হু হু করে কেঁদে ওঠে কেদার। কিন্তু ওর কান্না কেউ শুনতে পায় না। পনেরো বছর আগেও কেউ শুনতে পায়নি। শুধু দূর থেকে ওর কানে ভেসে আসে কিছু কথা, তোমাকে তো বাঁচতে হবে! শরীরে রক্ত না থাকলে বাঁচবে কী করে? রক্ত খাও, প্রাণ বাঁচাও। চোখ মুছে জানালার কার্নিশে রাখা ফুলদানিটা হাতে নিয়ে পরম যত্নে হাত বোলাতে বোলাতে বলে, — এবার আমার কালী আসবে। সব কিছু সংহার করতে যে মত্ত হয়েছে এবার সে কালীকে আমি যত্ন করে কেটে, গুছিয়ে ফ্রিজে রেখে দেব।

১৯

এখন পান্ডের ঘরে বসে নিজের মাথা টিপে ধরে আছে অভিদা। মংলু ভাঁড়ে চা ঢেলে ঈশানকে এগিয়ে দিতে গিয়ে ওর মুখ দেখে আবার পিছিয়ে গেল। আরোহী ওর ফোন থেকে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজির আর্কাইভ নোটসের মধ্যে আরও ডিজঅর্ডার খুঁজতে লাগল। অভিদাকে দেখেই মনে হচ্ছে রীতিমতো বিরক্ত হয়ে গেছে। ওরাও তো কেমন অন্ধকারে ছোটাছুটি করছে মনে হচ্ছে। ঈশান একটু কেশে নিয়ে বলল, — আমার স্যার আজকে একটা কথা বললেন যে, পাস্ট রেকর্ড আছে এরকম কেউ না হয়ে খুনি যদি নতুন কেউ হয়, যার ছোটো থেকে ফিমেল ফিগারের সঙ্গে কমপ্লিকেশন ছিল! এরকম কেউ হলে তো থানা বা কোর্টের ফাইলে নাম থাকার কথা না।

অভিদা মুখ তুলে বলল, — এটা তো হতেই পারে। কিন্তু অপরাধী কে, এর থেকেও বেশি দরকার অপরাধের মোটিভটা জানা। এটা তো সিরিয়াল কিলিং হচ্ছে। তাই প্যাটার্ন

ক্র্যাক না করতে পারলে, পরবর্তী টার্গেট কে সেটা বুঝতে না পারলে আর-একজন মেয়ে উধাও হয়ে যাবে। ঘটনার গুরুত্ব বুঝতে পারছিস এবার?

পান্ডে অভির দিকে জলের গ্লাস এগিয়ে দিয়ে বললেন, — অভি বোসো। এরকম করলে ঠান্ডা মাথায় ভাবতে পারবে না ভায়া। মেয়েগুলোর কোনোরকম ট্রেস পাওয়া যাচ্ছে না কেন সেটা নিয়ে ভাবা যাক।

— আমিও সেটাই ভাবছি পান্ডে। এতদিন আমাদের ফোকাস ছিল, কে করতে পারে? 'হু ডান ইট' মেথডে ভাবছিলাম। কিন্তু এখন আগে ভাবছি কীভাবে কী করছে? পরের টার্গেট কাকে করেছে? আমি একটা চার্ট বানিয়েছি, কিন্তু প্যাটার্নটা ধরতে পারছি না।

ওদের কথা শুনতে শুনতে ফোন থেকে চোখ তুলে আরোহী বলল,

— উধাও হয়ে যায় বলতে যদি ফেটিশিজম ভাবি তাহলে ক্যানিবালিজম আর ড্রাকুলারিজমও তো হতে পারে!

মংলু চমকে আরোহীর দিকে তাকাল। ঈশান মংলুকে বলল,

— মানুষখেকো মানুষের কথা বলছে! আরোহীকে জিজ্ঞেস করল,

— আচ্ছা ক্যানিবালিজম বা ব্লাড অবসেশন, মানে ড্রাকুলারিজম যেটা বলছিস, সেক্ষেত্রে শুধু মেয়েদের টার্গেট করে কোন কাতারে? মানে সেখানে কি ছোটোবেলায় মা বা ফিমেল ফিগারের সঙ্গে জটিল মনস্তত্ত্বের ফ্রয়েডিয়ান থিয়োরিটা খাটছে?

উত্তরটা অভিদা দিল, — ফরেনসিকে 'এক্সেপশনাল কেসেস অফ ক্রিমিনাল সাইকোলজি' পড়ানোর সময় রেনফিল্ড সিনড্রমের ব্যাপারে পড়িয়েছিলাম। সবার দিকে তাকিয়ে ব্যাখ্যা করার ভঙ্গিতে বলল, — রেনফিল্ড লোকটা ছিল ডিলুউশনের পেশেন্ট, তার মনে হত মাকড়সা আর পিঁপড়ে খেলে সে ওদের শক্তি নিজের মধ্যে আনতে পারবে। তাই মাকড়সা আর পিঁপড়ে ধরে ধরে খেত। এই সিনড্রোমে আক্রান্ত মানুষ প্রথম প্রথম নিজের রক্ত খায়। তারপর পশুপাখি, এমনকি মানুষের রক্তও খায়।

ঈশান বলে ফেলল, — কেসটা হু ডান ইট থেকে হাউ ডান ইট-এর দিকে ভাবতেই কেমন হাঁউ মাঁউ খাঁউ হয়ে যাচ্ছে না?

পান্ডে জিজ্ঞেস করলেন, — এক্ষেত্রে কিলারের অতীতের কোনো খারাপ অভিজ্ঞতা জড়িয়ে থাকতে পারে?

— চাইল্ডহুড ট্রমা, ইনসিকিয়োরিটি এক্ষেত্রে দায়ী হয়। একটা মানুষ, সে অন্যান্য মানুষের রক্ত খেয়ে তাদের শক্তি নিজের মধ্যে আনতে চাইছে সেটাও ডিজইলুউশনের ভিত্তিতে। মানে ওর মনে হচ্ছে ওকে কেউ ওরকম করতে বলছে তাই ও করছে।

— কী কমপ্লিকেটেড মাইন্ডসেট!

— একটা কিছু ক্লু যদি থাকত পান্ডে! তবে এটুকু বোঝা যাচ্ছে, ওরা প্রত্যেকে খুনির কাছে স্বেচ্ছায় গেছিল।

আরোহী বলল, — তা তো বটেই! যাওয়ার সময় কোনো ঝামেলা বা ফোর্স করা হয়নি কারও ক্ষেত্রেই। শুধু ওদের ফেরাটাই হল না। আচ্ছা এই ক্যানিবালিজম বা ড্রাকুলারিজম আমাদের ডিটেলসে পড়াবে না?

— তোদের সিলেবাসে থিয়োরি পার্ট যতটা আছে পড়ানো হবে। তবে এগুলো নিয়ে হাতে-কলমে ঐতিহাসিক সত্যতা যাচাই করে সিরিয়াসলি কাজ হয় এথনোলজি, ফিজিক্যাল অ্যানথ্রোপোলজি ডিপার্টমেন্টে।

আরোহীর মনে পড়ল, বাসবীর বন্ধু শাশ্বতর গ্র্যাজুয়েশনে অ্যানথ্রোপোলজি ছিল পাস কোর্সে। ওইদিন কুমোরটুলিতে আলাপ হওয়ার সময় বলছিল। ও ভাবল বাড়ি গিয়ে একবার বাসবীর থেকে সিয়োর হয়ে শাশ্বতর সঙ্গে কথা বলে দেখবে। যদি কোনো ক্লু পাওয়া যায়! এমন সময় অভিদা ফেরার কথা বলতে ওদের টনক নড়ে যে বাড়ি ফিরতে হবে। লাল দালান থেকে বেরিয়ে গাড়িতে ওঠার সময় অভিদা ওদের বলে গাড়িতে উঠে বসতে। যেতে যেতে আলোচনা করা যাবে। ঈশান গাড়িতে উঠেই সিটবেল্ট বাঁধতে বাঁধতে ওর পেটে জমে থাকা কথাগুলো উগড়ে দিতে লাগল, — ভালো কথা বলছি শোনো, ওই মংলু ব্যাটার মধ্যেই ঘাপলা আছে। আমার শুরু থেকেই ওকে সুবিধার লাগেনি।

— ধ্যাৎ! তুই বায়াস হয়ে যাচ্ছিস।

— না রে আরোহী! তুই নিজেই ভেবে দ্যাখ। অভিদা, ওর কিন্তু স্ট্রং মোটিভ আছে।

— কীরকম?

— আমাদের প্রথম হাইপোথিসিস, ফিমেল ফিগারের প্রতি জটিলতা। মংলুর প্রেমিকা ওকে প্রথমে প্রেমে ভাসিয়ে, তারপর ভুলভাল কেসে ফাঁসিয়ে; অন্য একটা বিয়ে করে চলে গেল। এটা কি কম ট্রমার ব্যাপার? এদিকে শৈলজা থেকে মাধব দাস বা নিলয় ব্যাপারী, সবার ওপর ওর নজর ছিল। অর্থাৎ সবার গতিবিধিই ও জানত। যতদূর জানি, মালটা, ইয়ে সরি লোকটা একা থাকে। কী খায় রক্ত না মাংস, কেউ কি দেখতে গেছে বলো? আরোহী আজকে ক্যানিবাল বলতেই ও ব্যোমকে গেছিল। আমি স্পষ্ট দেখেছি। ওরকম গেটআপ নিয়ে থাকলে অনেক কিছুই সহজ হয়ে যায়। নিজে প্রেমে দাগা খেয়ে জেল খেটেছে। এখন বাকি নারীদের টার্গেট করে ধরে ধরে গুম করছে। আর যেহেতু আমাদেরই স্পাই, ওর ঘরটা সার্চ করার কথা কারও মাথায়ই আসবে না। কোথায় থাকে জানো?

গাড়ি ডানদিকে ঘোরাতে ঘোরাতে অভিদা বলল, — পান্ডে বলেছিল, নিমতলা শ্মশানের সামনে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে। প্রতি অমাবস্যায় শ্মশানকালীর পুজোও নাকি করে।

— ওমা গো! কালীকে নরবলির নামে নারীবলি দেয় কিনা দ্যাখো!

আরোহী পেছন থেকে ঈশানের মাথায় চাঁটি মেরে বলল,

— চুপ করবি তুই? জোরজবরদস্তি লোকটাকে ব্লেম করছিস। ও এতদিন ধরে পুলিশের হয়ে কাজ করছে...

— এজন্যই তো! এটাই তো ওর ডিফেন্স! ওর দিকে কারও নজর যাবে না।

অভিদা ততক্ষণে বাসস্ট্যান্ডে চলে এসেছে। ওদের নামিয়ে দিয়ে ভাবল, ওর অবস্থা এখন 'যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দ্যাখো তাই'। ঈশানের যুক্তিটাই বা বাদ যায় কেন!

২০

আর একদিন পরেই মহালয়া। আকাশের চাঁদটা মৃতপ্রায়। নিমতলা শ্মশানঘাট অন্যান্য রাতের তুলনায় বেশিরকম নির্জন এখন। শ্মশানকালীর মন্দিরের সামনে জ্বলতে থাকা কিছু ধূপকাঠির ধোঁয়া শ্মশানের অন্ধকারে যোগ্য সংগত করছে। পান্ডের দেওয়া ঠিকানায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে অভিজ্ঞান জানালার কাচ খুলে দিল। শ্মশান বলেই নাকি কে জানে! গায়ে যেন শিরশিরে হাওয়া এসে লাগল। বাইরে তাকাতেই অভি দেখতে পেল, অদূরে ওর একচালা ঘরের দাওয়ায় বসে শ্মশানকালীর মন্দিরের দিকে তাকিয়ে মংলু কথা বলছে... না গান গাইছে মনে হয়। গাড়িটা ধীর গতিতে আর-একটু এগিয়ে নিতেই স্পষ্ট শুনতে পেল মংলু গাইছে,

"আমার গায়ে যত দুঃখ সয়
বন্ধুয়া রে করো তোমার মনে যাহা লয়।।
নিঠুর বন্ধু রে, বলেছিলে আমার হবে
মন দিয়াছি এই ভেবে
সাক্ষী কেউ ছিল না সেসময়।
সাক্ষী শুধু চন্দ্র-তারা,
একদিন তুমি পড়বে ধরা রে বন্ধু
ত্রিভুবনের বিচার যেদিন হয়"।।

বেশ মন দিয়ে শুনতে শুনতে নিজের অজান্তেই স্টিয়ারিঙে আঙুল দিয়ে তাল ঠুকছিল অভি। না, মংলুর গানের গলা শুনলে ঈশান হয়তো নিজের কানে তুলো দিত। কিন্তু মনে কতটা কষ্ট থাকলে এরকম হৃদয় নিংড়ানো দরদ দিয়ে গাওয়া সম্ভব তা অভি খানিকটা আন্দাজ করতে পারে। এমন সময় ওর মধ্যে থাকা ভবানীপুরের অভি জেগে ওঠে। সুদূর আমেরিকার একটা নির্দিষ্ট নম্বরে ফোন করতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছেগুলো নিজের নিশ্বাসে চেপে ও স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে দেয়। সাতবছর ধরে পুলিশের স্পাই হয়ে

থাকা মংলু অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে, গান গাইতে গাইতে টের পায় না একটা গাড়ি ওর পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল, যার নম্বর ওর জানা।

২১

বাড়ি ফিরে ঈশান ওর মাকে ফোন করে জানাল যে ও বাড়ি পৌঁছে গেছে। সারাদিন পরে ফিরে মায়ের সঙ্গে রোজ কথা বলে ঈশান। বাবা তখনও ফ্যাক্টরি থেকে ফেরে না। তাই বাবার সঙ্গে সকালের খাবার খেতে খেতে কথা বলে নেয়। ঈশানের মা লক্ষ করছেন, ছেলের কথার মধ্যে আজকাল আরোহী নামটা বারবার চলে আসছে। ছেলেকে বাজিয়ে দেখার জন্য কথার মধ্যে তিনি হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, — আরোহীকে প্রোপোজ করেছিস?

ঈশান বেশ গুছিয়ে টোপটা গিলে বলল,

— নাহ্, আজকে তো হল না কাজ-টাজের মধ্যে। কাল-পরশুর মধ্যে করে ফেলব

বলেই ওর নিজেকে পাণ্ডা মনে হল। মনে মনে আওড়ে নিল, আমি পাণ্ডা। বাঁশ আমার প্রিয় খাদ্য। কিন্তু ঈশানের মা ওকে 'অল দ্য বেস্ট' বলে ফোন রেখে দিলেন। যদিও ঈশান বুঝতে পারল না এই সিগন্যালটা লাল না সবুজ!

রাতে বাড়ি ফিরে আর স্টাডিতে না ঢুকে সোজা ওপরে উঠে এল অভিজ্ঞান। ভালো করে স্নান সেরে বিছানায় শুয়ে পড়ল। সিলিঙের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল, এদিক-সেদিক কোনো ক্লু ছড়িয়ে আছে কিনা! জীবনের প্রথম কেস বলেই নাকি কে জানে! গোটা ব্যাপারটাই ওর কাছে অ্যাবসার্ড লাগছে। কংক্রিট ক্লু দরকার। দেয়ালের দিকে তাকিয়ে হাতের নখ খেতে খেতে ও ভাবছে, — ভিক্টিমরা সবাই একজন অন্যজনকে চেনে না, কিন্তু ওরা সবাই কিলারের পরিচিত। ওদের সবার কমন ফ্রেন্ড কে হতে পারে? ছাত্র ইউনিয়নের কেউ হলে তাকে সাংসদ, প্রফেসর, পুলিশ আচ্ছা সেনাও নয় চিনল। কিন্তু বুটিকের মালকিনকে চিনল কী করে? পেশাগত সূত্রে বা মিউচুয়াল ফ্রেন্ডের মাধ্যমে সুরভির সঙ্গে তনয়ার যোগাযোগ থাকা অস্বাভাবিক নয়। সুরভির নিখোঁজ হওয়ার পর যদি আরএকটু সিরিয়াসলি কেসটা হ্যান্ডেল করা যেত! এদিকে প্রফেসর বাণীশ্রী গুহ, বুটিক ওনার বৈজয়ন্তী বাসু নিখোঁজ হলেও ওদের সোশ্যাল মিডিয়ার আইডি মোছা হয়নি। তাহলে তনয়া বা সুরভির আইডিতে কী এমন ছিল? শৈলজা মিত্রের ড্রাইভারের থেকেও কিছু জানতে পারেনি টিম। কী মনে হতে অভিজ্ঞান এত রাতেও ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্টে ফোন করে জিজ্ঞেস করল, ভিক্টিমদের মধ্যে কারও ডায়ারি লেখার অভ্যাস ছিল কিনা! ওদের, বিশেষ করে সুরভি, তনয়ার ঘর সার্চ করে কোনো ডায়ারি পাওয়া গেছে কিনা দেখতে বলল।

কেসটা নিয়ে ভাবতে ভাবতে কখন চোখ লেগে গেছিল খেয়াল নেই। পরদিন সকালে অভির ঘুম ভাঙল পান্ডের ফোন পেয়ে,

— অভি, তুমি ভিক্টিমদের সব জিনিসপত্র রি-চেক করতে বলেছ শুনলাম!

— হ্যাঁ, স্পেশালি ডায়ারি বা চিঠিজাতীয় কিছু। খেয়াল করে দ্যাখো, তনয়া শান্তিনিকেতন থেকে বাড়ি না গিয়ে কিলারের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে, সুরভি এতদিন পর ছুটি পেয়েও বাড়ি ফেরার আগে ওর কাছে যাচ্ছে। কেউ কতটা ইম্পরট্যান্ট হলে মানুষ এরকম করে বুঝতে পারছ?

— হুমম, তুমি ফ্রেশ হয়ে চলে এসো। ততক্ষণে কী উদ্ধার করা যায় দেখি।

বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁত মাজতে মাজতে আরোহী আর ঈশানকে ফোন করে বলল থানায় পৌঁছে যেতে।

২২

পান্ডের ঘরে ঢুকেই মংলুকে দেখে অভিজ্ঞান একটু চমকাল। কাল রাতে ওর অজান্তে ওর নিষিদ্ধ পরিধিতে ঢুকে পড়েছিল বলে একটু বিব্রতও হল। সি আই টিম থেকে প্রশান্ত মৃধা এসে ওকে একটা ডায়ারি দিয়ে গেল। ভিক্টিমদের মধ্যে একমাত্র সুরভিরই একটা ডায়ারি পাওয়া গেছে। অভিদা গ্লাভস পরে ডায়ারিটা খুলতেই ওর দুই ঘাড়ের ওপর দিয়ে আরোহী আর ঈশান ঝুঁকে পড়ল। পান্ডে আর মংলু টেবিলের অন্যদিক থেকে দেখছে। পাতার পর পাতা ওলটাতে ওলটাতে একটা পাতায় লাল কালিতে লেখা আছে,

"কর্ণ তুমি। আর কবচ-কুণ্ডল পরে থাকি আমি। আমি সুরভি রক্ষাকবচ তোমার"

অভিদা লেখাটা কিছুক্ষণ মন দিয়ে দেখে আবার পাতা ওলটাতে লাগল। শেষের দিকের পাতায় কালো কালি দিয়ে লেখা, সুরভি চৌধুরী। শব্দদুটো কেটে তার পরের লাইনে আবার লিখেছে, সুরভি সাউ চৌধুরী।

— স্ট্রেঞ্জ!

পান্ডের কথা শুনে মুখ তুলে তাকাল অভিজ্ঞান,

— মনে হচ্ছে সুরভির মনের মানুষটার নাম কর্ণ চৌধুরী। এখন দেখতে হবে, তনয়া, শৈলজা, বাণীশ্রী এবং বৈজয়ন্তী এঁরা কর্ণ চৌধুরী নামে কাউকে চেনে কিনা!

ঈশান জিজ্ঞেস করল,

— 'কবচ-কুণ্ডল পরে থাকি' মানে সুরভি সাউ কি ওঁর সেনাবাহিনীর পোশাককে বোঝালেন?

অভিদা হেসে বলল, — ইয়েস ঈশান! গুড ডিডাকশন! নিজের দায়িত্বের কথা মাথায় রেখেই রক্ষা- কবচ হওয়ার কথা বলেছে।

— হুমম! এবার তাহলে বাকিদের জিনিসপত্র ঘেঁটে দেখলে হয় না?

— সেসব ঘেঁটেই তো সুরভির এই ডায়ারিটা পাওয়া গেল।

পান্ডে নিজের ডান গাল চুলকে বললেন,

— আমি কী ভাবছি মুখার্জি, ভিক্টিমদের ঘরগুলো আর একবার চেক করা যাক। তুমি যদি কিলারের সঙ্গে ওদের পার্সোনাল সম্পর্কের কথা ভাবো তাহলে ওদের ঘরেও তো কিছু থাকতে পারে! পার্সোনাল জিনিস যেহেতু—

অভিজ্ঞান মৃদু হেসে নিশ্বাস ছেড়ে পান্ডেকে বললেন, — খারাপটা কোথায় লাগে জানো! যে তদন্তটা সুরভির কেসের সময় থেকে হওয়ার কথা ছিল সেটা বছর ঘুরে এখন হচ্ছে। এমনই দুর্ভাগা রাজ্যের হয়ে কাজ করছি আমরা, যেখানে রাজনৈতিক নেত্রী বিপদে না পড়লে কেসের গুরুত্ব বাড়ে না। যাই হোক! আমার মনে হয় প্রথমে শৈলজা মিত্রের বাড়ি দিয়ে শুরু করা ভালো। তাহলে বাকিদের বাড়ি সার্চ করা আরও সহজ হবে।

— বাড়ি কিন্তু আগেও সার্চ হয়েছে অভি। আমার মনে হয় এবার তুমি টিমের সঙ্গে ফিল্ডে গিয়ে দ্যাখো। কিছু ক্যাজুয়াল জিনিস থেকেও ও অনেক সময় অনেক কিছু বোঝা যায়।

— দেখছি। বলেই আরোহী ঈশানের উৎসুক চোখের দিকে তাকিয়ে বলল,

— না তোদের নিয়ে যাব না। আগে ভালো করে তৈরি হয়ে নে, তারপর ফিল্ডে যাবি।

আরোহী বলল, — বেশ অভিদা তাই হবে। কিন্তু আমার মনে হয় বাকিদের শুধু বাড়ি না, ওদের বন্ধুদেরও একবার জিজ্ঞেস করে দেখা যেতে পারে। বয়ফ্রেন্ডের কথা যেমন বন্ধুরা বন্ধুদের বলে সেরকম কিছু যদি...

— মন্দ বলিসনি, তবে তোর এই যুক্তিটা শুধু তনয়ার ক্ষেত্রেই খাটে। শৈলজা মিত্র ওঁর পজিশনের কথা ভেবে কাউকে বলবেন না। যে সম্পর্কের কথা আমরা ভাবছি বাণীশ্রী গুহর ক্ষেত্রে তা হবে পরকীয়া। পরকীয়ার কথা তো মানুষ নিজের ছায়াকেও বলে না। আর বৈজয়ন্তী বাসুর তো কলকাতায় বন্ধু খুঁজে পাওয়াই ভার!

— হুমম, তাহলে অভি তুমি টিমের কয়েকজনকে নিয়ে শৈলজা মিত্রের ফ্ল্যাটে চলে যাও। সার্চ ওয়ারেন্ট পেয়ে যাবে।

— হ্যাঁ আর টিমের বাকিদের বলি তনয়ার বন্ধুদের থেকে খোঁজখবর নিয়ে দেখতে। মংলু তুমিও তোমার মতো খোঁজ চালাতে থাকো।

— বেশ, বেশ!

বেশ কিছু কাজ মাথায় সাজিয়ে নিয়ে ঈশানের সঙ্গে বেরোচ্ছিল আরোহী। কী মনে হতে ঘুরে গিয়ে অভিদাকে জিজ্ঞেস করল,

— আচ্ছা আমরা রেনফিল্ড সিনড্রোম নিয়ে ভাবছি মানে ফেটিশিজমকে বাদ দিয়ে দিচ্ছি কি?

— না না তা কেন! ফেটিশিজমের কেসে নিলয় ব্যাপারীর ধারণাটা খাটেনি। তা বলে এই কর্ণ চৌধুরী যে ফেটিশ নয় এটা বলা যায় না। মোটিভের দিক দিয়ে সব সিনড্রোমই মাথায় রাখা দরকার। আর-একটা জিনিসও আমার মনে হচ্ছে যে, কর্ণ নামটা ছদ্মনাম এবং এই নামেই সুরভি, তনয়ার মতো ভিক্টিমের সঙ্গে যোগাযোগ করত।

— সোশ্যাল মিডিয়ায় ফেক অ্যাকাউন্ট খুলে?

— হতে পারে। নয়তো ওদের অ্যাকাউন্টগুলো এভাবে মুছে যেত না।

ঈশান বলল, — একটা জিনিস এক্ষেত্রেও মিলে যাচ্ছে, মাদার ফিগারের প্রতি কমপ্লিকেশনটা। মহাভারতে কর্ণ চরিত্রের মধ্যে কুন্তীকে নিয়ে কম জটিলতা তো ছিল না।

— আর তাই ছদ্মনাম নেওয়ার সময় অপরাধীর অবচেতনে কর্ণ নামটাই এসেছে। ঠিক বলেছিস ঈশান। গুড!

অভিদার আশকারা পেয়ে ঈশানের মনে হল আজকের দিনটা ওর ভালো যাচ্ছে। আরোহীকে আজকেই ওর প্রোপোজ করা উচিত। আরোহী পান্ডের ঘর থেকে বেরিয়ে বড়ুয়ার কাছে যাচ্ছে রেনফিল্ড সিনড্রোম বা এ-জাতীয় কোনো কেস আছে কিনা দেখতে। ঈশানও ওর পাশে হাঁটছে। ভরদুপুরে ফাঁকা করিডরে দুজনের লম্বা ছায়া পড়েছে। ঈশান সেটা দেখে বলল,

— এই আরোহী, তোর ছায়া দেখে মনে হচ্ছে, একটা লাঠির ওপর কেউ একগাদা নুডলস ঝুলিয়ে দিয়েছে।

— আমার চুল কোঁকড়া বলে এরকম বলবি তুই!

— আরে খেপে যাস না! আমার নিজের ছায়াও আমার ভালো লাগে না। কিন্তু আমাদের দুজনের ছায়াদুটো পাশাপাশি হেব্বি লাগছে দ্যাখ! আমি এই ছায়াজোড়ার মায়ায় পড়ে গেছি। আমরা এভাবে থেকে যাই আরোহী?

ঈশানের শেষ কথায় আরোহী যেন একটু কেঁপে উঠল। তারপর একটু কেশে স্বাভাবিক হয়ে বলল, — থানায় দাঁড়িয়ে এসব কথা বললে তোকে আর উকিল হতে হবে না। বরং বসন্তের কোকিল হয়ে যা।

— আরে কোকিলের তো পার্টটাইম জব। আমি ফুলটাইম থাকতে চাই তোর সঙ্গে। সত্যি!

আরোহী ওর উত্তরে কিছু একটা বলত, কিন্তু তখনই ওর ফোন বেজে উঠল। ঈশানকে হাতের ইশারায় দু-মিনিট বলে ও ফোন কানে দিয়ে এগিয়ে গেল।

২৩

বাড়ি ফিরে অভিজ্ঞান হাতমুখ ধুয়ে স্টাডিতে এসে বসল। পরপর অনেক কিছু ভেবে যাচ্ছে সমানে। কলেজে কলেজে রাজনৈতিক অসন্তোষ যেন হঠাৎ করে থিতিয়ে গেল বাণীশ্রী গুহর নিখোঁজ হওয়ার পর। সবটাই কি তাহলে সেট-আপ ছিল? ওরকম হট্টগোলের মধ্যে ওঁকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া খুব সহজ ছিল। আর খুনি যদি মিসেস গুহর পূর্ব-পরিচিত হয় তাহলে উনি নিজেই এগিয়ে যাবেন স্বাভাবিক। আজকে শৈলজা মিত্রের বেডরুমের দেয়ালে টাঙানো তেলরঙে আঁকা কর্ণ ও পদ্মাবতীর ছবিটা বারবার চোখে ভাসছে। ভদ্রমহিলার আঁকার শখ ছিল সেটা জানা ছিল না। কিন্তু শোয়ার ঘরের দেয়ালে কর্ণ এবং ওঁর স্ত্রী পদ্মাবতীর এরকম একটা ছবি এঁকেছেন মানে সুরভির ডায়ারিতে লেখা কর্ণ এবং শৈলজার কর্ণ একই মানুষ হতেই পারে।

এতটুকু ভাবার পরে ওঁর ফোন বেজে ওঠে। টিমের কয়েকজনকে যে তনয়া মজুমদারের বন্ধুদের থেকে খোঁজ নিতে বলা হয়েছিল তাদের মধ্যে সাদ ফোন করেছে,

— বলো সাদ কী আপডেট?

— স্যার! তনয়ার স্কুলের এক বন্ধু শান্তার থেকে কর্ণর কথা জানা গেছে। শান্তা আর তনয়া একই পাড়ায় থাকত। ছোটো থেকে একসঙ্গেই থাকে। তো তনয়ার প্রেম বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে বলল, একবার ওর মুখে কর্ণকুন্তল চৌধুরীর নাম শুনেছিল। ওর সঙ্গে নাকি তনয়া ফোনে সারাক্ষণ চ্যাট করত বাড়িতে থাকলে। বন্ধুদের মধ্যে ওর এই হঠাৎ পরিবর্তনটা বেশ চোখে পড়েছিল। তনয়া নাকি এও বলেছিল যে, শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে ও কর্ণকুন্তলকে ওর ভালোবাসার কথা বলবে।

শুনতে শুনতে অনেক কিছু পরিষ্কার হতে থাকলেও রাগও হল অভিজ্ঞানের। সাদকে জিজ্ঞেস করল, — এই প্রশ্নগুলো আগে কেন করা হয়নি সাদ? শুরুতেই এত গাফিলতির কী কারণ?

— স্যার আসলে শৈলজা মিত্রের মিসিং কেসটা নিয়ে এত ব্যস্ত ছিল সবাই... কেসগুলো যে লিঙ্কে আছে এটা বুঝতেই দেরি হয়ে গেল।

— সেই! সাংসদ আর সাধারণ মানুষরা তো আর-এক কাতারে পড়ে না!

বলেই ফোন রেখে ভাবতে বসল আবার। ভাবতে গিয়ে মনে হল বিকেল হয়ে যাচ্ছে এখনও পেটে কিছু পড়েনি। ওপরে উঠে রান্নাঘরে এসে চিনি ছাড়া কালো কফি আর ডিম ভেজে নিয়ে নীচে এল। আরোহী কেস ফাইল ঘেঁটে কিছু পেল কিনা জানা দরকার। কিন্তু ওর ফোন দেখল সুইচ অফ বলছে। ঈশানকে ফোন করতে ও বলল,

— অভিদা, আরোহী তো আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে একটা ফোন পেয়ে বেরিয়ে গেল তখন। ওর বাড়িতে কোনো জরুরি কাজ থাকতে পারে হয়তো।

— সেটা একবার থানায় ওর মেন্টরকে ইনফর্ম করে যাবে না! ইন্টার্ন হয়ে এরকম কেয়ারলেস হওয়ার মানে কী?

ঈশান বুঝতে পারল, অভিদা রেগে গেছে আরোহীর ওপর। কিন্তু আরোহীকে প্রোপোজ করার পরে ও কি লজ্জায় ফোনটা অফ করে রেখেছে? অভিদাকে বলাটা কি ঠিক হবে যে ও আরোহীকে প্রোপোজ করেছে?

বিস্ময়ের তখনও শেষ হয়নি। রাত আটটা নাগাদ অভিজ্ঞানের ফোনে একটা অজানা নম্বর থেকে ফোন এল।

— হ্যালো, আমি কি অভিজ্ঞান মুখার্জির সঙ্গে কথা বলছি?

— বলছেন...

— আমি বাসবী দত্ত। আরোহী দত্ত আমার খুড়তুতো বোন। আমি যতদূর জানি ও আপনার টিমে কাজ করছে

— হ্যাঁ মিস দত্ত। আরোহী বাড়ি গেছে, কিন্তু আমাদের কাউকে বলে যায়নি। ও ঠিক আছে তো? বাড়িতে সব ঠিক?

চিন্তা হলেও এতক্ষণ বাসবী ঠান্ডা মাথায় কথা বলছিল। কিন্তু এখন সত্যি ভয় পেয়ে গেল,

— বাড়ি পৌঁছে গেছে মানে? ও সকালে আপনার ফোন পেয়ে লালবাজার গেল যে, তারপর তো আর ফেরেনি!

— কীহ্‌

— হ্যাঁ! রোজ সাতটার মধ্যে ও বাড়ি ঢুকে যায়। এখন রাত সাড়ে আটটা বেজে গেছে। এর মধ্যে ওর ফোনটাও বন্ধ হয়ে আছে। তাই বাধ্য হয়ে আপনাকে ফোন করলাম। আরোহী আপনার নম্বরটাই দিয়েছিল আমাদের।

অভিজ্ঞানের গলা দিয়ে কথা বেরোচ্ছে না। অনেকগুলো দুশ্চিন্তা যেন পাক খেয়ে গলায় আটকে গেছে। গভীরভাবে শ্বাস নিয়ে নিজেকে একটু শান্ত করে ও জিজ্ঞেস করল,

— শেষ কখন আরোহীর সঙ্গে কথা হয়েছে আপনার?

— লালবাজারে পৌঁছে ফোন করে জানিয়েছিল যে পৌঁছে গেছে; যেরকম রোজ জানায়। তখন সাড়ে এগারোটা বাজে প্রায়। এরপর তো আর কথা হয়নি। দুপুরে ফোন করেছিলাম খেয়েছে কিনা জানতে তখন ফোন বেজে গেল, ও ধরল না

— হ্যাঁ, তখন ওর ফোনটা সাইলেন্ট ছিল। ও কমিশনারের ঘরে ছিল বলে। ওখান থেকে তো আড়াইটে নাগাদ বেরিয়ে গেল। এখনও বাড়ি ফেরেনি! মেয়েটা গেল কোথায়? আমি একবার থানায় জিজ্ঞেস করে দেখি। আপনারা খুব টেনশন করছেন জানি। তাও বলব মাথা ঠান্ডা রেখে ভাবুন, কোথায় যেতে পারে ও?

ফোনটা কেটে চেয়ারে বসে দুহাতে মাথার চুল খামচে ধরল অভিজ্ঞান। সবমিলিয়ে ওর খুব ক্লান্ত লাগছে এখন। মনে হচ্ছে গুজরাটের দশটা-পাঁচটার চাকরি, ছাত্র পড়ানো দিব্য চলছিল। কে জানত সেসব বইয়ের থিয়োরিগুলো নিয়ে ফিল্ডে নেমে এরকম ধোঁয়াশায় জীবন কাটাতে হবে! আরোহী মেয়েটা বেশ সিরিয়াসলি কাজকর্ম করে। এই বয়সে ওর উদ্যম দেখে ভরসা হয়। কিন্তু ও গেল কোথায়? ভাবতে ভাবতে মনে পড়ল, শৈলজা মিত্রের বাড়ির দিকে রওনা হওয়ার সময় মংলু ওকে বলেছিল, ঈশান নাকি আরোহীকে প্রেম নিবেদন করে ওর ছায়াসঙ্গিনী হতে বলেছিল। ঈশানকে ফোনে ধরল আবার, — ঈশান, আরোহী ওর বাড়ি যায়ইনি।

— কী বলছ! তাহলে?

প্রিয় মানুষকে নিয়ে দুশ্চিন্তা সবচেয়ে বেশি হয়। খারাপ চিন্তাটাই আগে মাথায় আসে। ঈশান বলে ফেলল, — কিলারের নেক্সট টার্গেট কি তাহলে আরোহী ছিল?

২৪

রাত পোহালেই মহালয়া। অথচ পুজোর কোনো আমেজই নেই শহরে। গোটা শহর যেন ভয়ে সিঁটিয়ে আছে। বিশেষ করে মেয়েরা। আরোহীর জন্য চিন্তায় ঘুম উড়ে গেছে ওর বাড়ির সবার। এখনও শিলিগুড়িতে খবর দেয়নি ওর জেঠু। ঈশান ওর মাকে ফোন করে আরোহীর কথা বলতে বলতে হাউমাউ করে কেঁদে ফেলেছে। এমনিতে একা থাকে শহরে, তার ওপর এই পুজোর সময় আরোহী নিখোঁজ বলে অসহায় লাগছে ওর। বাসবীর থেকে ঠিকানা নিয়ে রাত দশটায় ঈশানকে নিয়ে ওদের বাড়ি গেল অভিদা। বাসবীর বাবা-মাকে ভালো করে বুঝিয়ে শান্ত হতে বলল। আরোহীর কথা থেকেই ঈশান আর বাসবী নিজেদের চিনতে পারল। ঈশানের চোখমুখ দেখে বাসবীর আরও বেশি কান্না পেয়ে গেল আরোহীর জন্য। ওদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে অভিজ্ঞান মন্দাক্রান্তাকে ফোন করে আরোহীর কথাটা জানাল। আক্ষেপ করে বলল, — আমি তোর স্টুডেন্টকে সাবধানে রাখতে পারিনি মন্দা! আজকের রাতটা কেটে গেলে জানি না কী হবে!

অভিদার কথা শুনে ভয়ে ঈশানের দমবন্ধ হয়ে এল। এরকম করে আরোহী হারিয়ে যেতে পারে? এত সহজ নাকি? জীবন এত সস্তা? এদিক-ওদিক ভাবতে ভাবতে ও নির্জীব গলায় অভিদাকে বলল, — অভিদা, আগের ভিক্টিমরা যদি কিলারকে চিনে থাকে আর আরোহীই যদি নেক্সট টার্গেট হয় তাহলে সে আরোহীরও পরিচিত। তাই না?

— পরিচিত বন্ধু-বান্ধব কারও বাড়িতে যখন যায়নি তাহলে তাই। কিন্তু কলকাতায় আরোহীর পরিচিত আর বাসবীরা কেউ জানে না এরকম কে হতে পারে?

— যেই হোক না কেন, তাকে খুঁজে বের করতেই হবে। আরোহীর কিছু হবে না। ও ঠিক সুস্থভাবে ফিরে আসবে।

ঈশানের কাঁধে হাত রেখে অভিদা বলল,

— তুই আজ আমার সঙ্গে থাকবি চল। তোর ফ্ল্যাটে ফিরতে হবে না। দুজন একা একা টেনশন করার থেকে একসঙ্গে কোনো একটা উপায় বের করব চল।

ঈশানকে সল্টলেকের বাড়িতে নিয়ে এসে অভিজ্ঞান কিছু খাওয়ানোর চেষ্টা করল কিন্তু ও কিছু খেল না। অভিজ্ঞ চোখে বুঝল, আজ দুপুরে প্রোপোজ করলেও আরোহীকে ও আরও আগেই ভালোবেসে ফেলেছে। কীই-বা বয়স ওদের! একা ফ্ল্যাটে তাই ঈশানকে রাখতে মন সায় দেয়নি অভিজ্ঞানের। ঈশানের মন ঘোরানোর জন্য ওর মাথায় কেসের চিন্তা ঢুকিয়ে দিল,

— পেশাগত দিক দিয়ে দ্যাখ কারও কোনো মিল নেই। সেনা, পুলিশ, সাংসদ, প্রফেসর, বুটিক ওনার আর এখন স্টুডেন্ট, ইন্টার্ন আরোহী।

— হুমম্ এক-একজন এক-এক পেশার মানুষ।

— তোর কাউকে সন্দেহ হচ্ছে?

— আমি নিজেই তো অপয়া। জানো ওকে আজকেই প্রোপোজ করেছিলাম।

— জানি। মংলু বলেছে।

— মংলু বলেছে! ও জানল কী করে?

— ওর তো কাজই সবদিকে নজর রাখা।

— ও জানে আরোহী নিখোঁজ? এখন কোথায় আছে ব্যাটা? নজর রাখেনি কেন আরুর ওপর?

— রাগ করিস না। রাত নটার পর ওকে পাওয়া যায় না। শ্মশানে বসে গান করে। ওকে একটা ফোন করে দেখি বরং...

— মংলুর ফোনটা বেজে গেল। ওকে সকালে চেষ্টা করে দেখব।

চরম দুশ্চিন্তার মধ্যে ঈশান অধৈর্য হয়ে বলল, — আরোহীর ফোন বন্ধ। মংলু ফোন ধরছে না। মংলুর বাড়িতে গিয়ে সার্চ করা উচিত না?

— ঈশান, মংলু মানুষটা মানসিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ নয়। পান্ডে বলছিল, একবার জরুরি কেসের জন্য বেরোনোর সময় মংলুর বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়ার পথে দ্যাখে, শ্মশানকালীর মন্দিরের সামনে কীসব ছক কেটে ও মন্ত্র পড়ছে। এই অবধি সব ঠিক ছিল। হঠাৎ ও গলায় হাত দিয়ে দেখে কিছু একটা নেই। তারপর কী করল জানিস? পাশের শিবমন্দিরে গিয়ে শিবের গলা থেকে রুদ্রাক্ষের মালা খুলে নিজের গলায় পরে নিল।

— কী?

— হ্যাঁ। তারপর আবার নিজের জায়গায় এসে বসে, মন্ত্র পড়তে লাগল। এই ঘটনার পর থেকে পান্ডে ওকে সেরকম ঘাঁটায় না। তবে ওর অবজার্ভেশন ক্ষমতা মারাত্মক। ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গিয়ে, আসল কাজ করে বেরিয়ে আসতে পারে। আর এতদিনের অভিজ্ঞতায় ওর সোর্সও মন্দ না। এজন্যই আরোহীর খোঁজ নিতে আমার ওকে চাই। ইনফ্যাক্ট আমি যে ওকে তনয়ার বন্ধুদের ব্যাপারে খোঁজ নিতে বলেছিলাম সেটাও জানায়নি কিছু।

— তাহলে আরোহীর সঙ্গে সঙ্গে মংলুও একই সময় থেকে বেপাত্তা!

— বলতে পারিস!

— তারপরেও বলবে মংলু সাধুপুরুষ?

— ওর কী মোটিভ আছে বল? আরোহীকে গায়েব করে ওর কী লাভ?

— সেটা ওর শ্মশানে না গেলে বুঝব কী করে?

অভিজ্ঞান কিছু বলতে যেতেই ওদের দুজনকে চমকে দিয়ে দরজার বেল বেজে উঠল। এতরাতে কে এল ভাবার আগেই ঈশান দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। দরজার বাইরে ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে মংলু। ঈশানের পেছনে অভিজ্ঞানকে দেখে মংলু তাড়াহুড়ো করে ভেতরে ঢুকে এল। অভিদার সামনে এসে ওর স্বভাবসিদ্ধ বাজখাঁই কণ্ঠে হাউহাউ করে বলল,

— কী কাণ্ড গো! আরোহীদিদিকে খুঁজে পাচ্ছ না? আরে কী মুশকিল! গেল কোথায়?

ঈশান ওর দিকে একপ্রকার তেড়ে এল — গেল কোথায় সেটা তো তুমি জানো! কোথায় রেখেছ আরুকে বলো!

মংলু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে ঈশানের দিকে। অভিদা পরিস্থিতি শান্ত করতে বলল,

— মংলু চেয়ারে এসে বোসো। তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে, ঠান্ডা মাথায় ভেবে উত্তর দেবে।

— বেশ বেশ। বসছি।

অভিজ্ঞান ওর চেয়ারে এসে বসল। ওর পাশে ঈশান হাতদুটো আড়াআড়ি করে বুকের ওপর রেখে, দাঁড়িয়ে খর চোখে মংলুকে দেখছে। অভিদা জিজ্ঞেস করল,

— ফোন কোথায় তোমার?

— সাইলেন্ট করে রেখেছি পকেটে।

— ওহ্ তুমি থানাতেই ছিলে?

— হ্যাঁ স্যার! পান্ডেস্যারের কাছে আরোহীদিদির খবরটা পেয়েই হুড়মুড়িয়ে চলে এলাম। আহা রে! ফুলের মতো মেয়েটা! ঈশানদাদার কষ্ট হচ্ছে খুব।

— আচ্ছা মংলু, নিলয় যেদিন কুমোরটুলি ঘাটে ডুবে মারা যায়, তুমি সেদিন ওখানে ছিলে তো?

— হ্যাঁ। নিলয় তো ওর দাদার শ্রাদ্ধ করতে সেদিন ঘাটে গেছিল। জেলে ওর দাদা মরে গেছিল তো! তাই শ্রাদ্ধ করে ঘাটে গিয়ে ডুব দেয়। আর উঠল না গো।

— পুরনো প্রেমিকার বিচার চাও না তুমি?

কথাটা শুনে মংলুর চোখের আলোটা কেমন নিভে গেল। মলিন হেসে বলল,

— বিচার করার আমি কে গো দাদা! সে যা করেছে, তার ফল সে ভোগ করছে। কালীর কোনো সন্তান যে বিচারের ঊর্ধ্বে নয় গো। ভালো নেই জানো দাদা! আমার পুতুল ভালো নেই। ওর স্বামীটা কী হারামি! পুতুলকে মারে। টাকা না দিলেই মারে। পুতুল কাঁদে। কিন্তু ও কি ফিরতে পারে? পারে না। বিচার সবাই পেয়ে যায়।

অভিদা ঈশানের দিকে তাকিয়ে মংলুকে জিজ্ঞেস করল,

— মংলু আমি জানি তোমার সবদিকে নজর থাকে। আরোহীকে থানা ছাড়া এর মধ্যে কোথাও আসা-যাওয়া করতে দেখেছ তুমি?

— হ্যাঁ। বিদ্যাসাগর কলেজে যেত। একজন ম্যামের সঙ্গে বেরোত কলেজ থেকে। তারপর একটা দিদির সঙ্গে বেরিয়েছিল তো কুমোরটুলিতে।

ঈশান বাসবীর থেকে নেওয়া ওর নম্বরের হোয়াটস্যাপ ডিপি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল,— এই দিদির সঙ্গে?

— হ্যাঁ হ্যাঁ! এই দিদিই তো ছিল সেদিন। সঙ্গে একটা তোমার বয়সি দাদাও ছিল গো। না তোমার থেকে একটু বড়োই হবে।

আরোহী যেহেতু শাশ্বতর কথা অভিদা, ঈশানকে জানায়নি, তাই ওরা কেউ বুঝতে পারল না দাদাটা কে? বাসবী অবশ্য ঈশানকে বলে দিয়েছিল; যত রাতই হোক কোনো খবর পেলে বা দরকার হলে, ওকে ফোন করতে। ঈশান তাই বাসবীকে ফোন করে শাশ্বতর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে ডিটেলে জেনে নিল। বাসবীর ঘুম আসছিল না চিন্তায়। ভাবছিল শাশ্বতকে ফোন করে বলবে সবটা। কিন্তু ঈশান ফোন রাখার আগে কাউকে কিছু জানাতে বারণ করল বলে ও আর শাশ্বতকে ফোন করল না। অভিদা ঈশানের থেকে শাশ্বতর ব্যাপারটা শুনে মংলুকে বলল খোঁজখবর নিতে। মংলু বেরিয়ে গেলে অভিদা বোর্ডের দিকে এগিয়ে গেল। মার্কার দিয়ে কিছু লিখতে গিয়ে ঈশানকে দেখে বলল, ওপরে গিয়ে একটু কফি কর না রে। আমি ভাবছি আজকে ঘুমোব না।

— যাচ্ছি

ঈশান ওপরে উঠে গেলে অভিদা মন শক্ত করে ওর করা ছকের নীচে আর-একটা নাম যোগ করল,

	নাম	পেশা	লাস্ট লোকেশন
১।	সুরভি সাউ	সেনা	কলকাতা স্টেশন
২।	তনয়া মজুমদার	পুলিশ	শিয়ালদহ
৩।	শৈলজা মিত্র	সাংসদ	টালিগঞ্জ মেট্রো
৪।	বৈজয়ন্তী বাসু	বুটিকের মালকিন	এসপ্লানেড মেট্রো
৫।	বাণীশ্রী গুহ	প্রফেসর	মানিকতলা
৬।	আরোহী দত্ত	ইন্টার্ন, ক্রিমিনাল সাইকোলজি	লালবাজার

ভেবে অবাক হল, লালবাজার থেকে ওদের টিমের মেয়েকেই উধাও করে দিল! কী সাংঘাতিক সাইকোপ্যাথ! ঈশানের থেকে পাওয়া শাশ্বতর ডিটেলস নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল অভিজ্ঞান। ওপরে ওঠার সময় স্টাডির লাইট অফ করতে গিয়ে বোর্ডের দিকে চোখ পড়ল আবার। শেষ লাইনে আরোহীর নাম দেখে নিজেকে অপদার্থ মনে হল খুব। ওপরে গিয়ে কফিমগ নিয়ে ঈশানের পাশে বসে বলল, — শাশ্বত ছেলেটার ব্যাকগ্রাউন্ড জানা খুব দরকার বুঝলি!

— কেন?

— ভেবে দ্যাখ, ও বাণীশ্রী গুহর প্রিয় ছাত্র। কলেজ ইউনিয়নের সঙ্গে ভালো যোগাযোগ ছিল। সেই সূত্রে শৈলজা মিত্রের সঙ্গে যোগাযোগ থাকা সম্ভব। এদিকে ও বাসবীকে নিয়ে বৈজয়ন্তীর বাসুর বুটিকে যাওয়ার কিছুদিন পর থেকেই ভদ্রমহিলা নিখোঁজ হন। শাশ্বতর সঙ্গে সেদিন বৈজয়ন্তীর আলাপ হয়েছিল এবং ওর কার্ডও শাশ্বতকে দিয়েছিলেন, তাই ফোন নম্বর পাওয়া তো নর্মাল। আর আরোহীকে তো শাশ্বত চেনেই বাসবীর সূত্রে।

— কিন্তু মোটিভ?

— এজন্যই তো ব্যাকগ্রাউন্ড জানতে হবে। একা থাকে। মা-বাবা নেই। ছোটোবেলায় মারা গেছেন। কীভাবে মারা গেলেন? তুই ভাব, সুরভি, তনয়া ছাড়া আর কারও সোশাল অ্যাকাউন্ট কিন্তু মুছে দেওয়া হয়নি। এদিকে শাশ্বতর বয়সও সুরভি, তনয়ার কাছাকাছি। তাহলে ওদের বয়ফ্রেন্ড হিসেবে শাশ্বতকে ভাবা কি খুব ভুল হবে বল? শাশ্বত তো কর্ণকুন্তল চৌধুরী ছদ্মনামে ওদের সঙ্গে ভাব জমাতেই পারে। আর বাণীশ্রী গুহ ওকে ছাত্র হিসেবে চিনতেন, বৈজয়ন্তী চিনতেন কাস্টমার হিসেবে আর আরোহীর দিদির বন্ধু ও। এমনকি ছেলেটার এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড ভাব; ফিজিয়োলজির ছাত্র, গ্র্যাজুয়েশনে পাসকোর্সে ফিজিক্যাল অ্যানথ্রোপোলজি ছিল। এদিকে কেমিস্ট্রিতে আগ্রহ আছে। মানে ওর ফেটিশ বা রেনফিল্ড যে

সিনড্রোমই থাকুক না কেন, বডি কেটে, প্রসেস করার সমস্ত বিদ্যেই এই গুণধরের জানা আছে।

ঈশান কেঁপে উঠল আরোহীর কথা ভেবে। বিড়বিড় করে বলল,

— কর্ণকুন্তল হোক বা শাশ্বত, ওর বাড়িটা সার্চ করা উচিত এক্ষুনি।

— পুলিশ ইতোমধ্যে ফর্মাল পোশাকে ওর মানিকতলার বাড়ি ঘিরে ফেলেছে ঈশান!

২৫

বেলা চারটে নাগাদ যখন এই ঘরে এসেছিল তখন ঘরে ধূপকাঠি জ্বলছিল। এখন ধূপকাঠি নিভে গেছে আর ঘরটাও ঘুটঘুটে অন্ধকার। কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল মনে পড়ছে না। কিন্তু চোখ খুলে বেশ কিছুটা সময় নিল অন্ধকারটা চোখে সইয়ে নিতে। জিন্‌সের পকেটে হাত দিয়ে দেখল ফোনটা নেই! কটা বাজে এখন? কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঘরের সাদা আলোটা জ্বলে উঠল। মুহূর্তের ঝলকানিতে চোখ বন্ধ করে ফেলল আরোহী। দৃষ্টি স্বাভাবিক করে সামনের ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করল,

— কোথায় ছিলে তুমি? আমি কি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম?

ঘরের আর একটা চেয়ার ওর সামনে এনে মুখোমুখি বসে ওকে বলল,

— না। তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলাম।

— মানে?

— ইয়ার্কি মারছি। খিদে পেয়েছে তো! খাবে কিছু?

— খাব। কিন্তু আমার ফোনটা কোথায় গো? কটা বাজে এখন? বাড়ি ফিরতে হবে তো!

— এখন রাত সাড়ে তিনটে বাজে। আর কিছুক্ষণ পরেই ব্রাহ্মমুহূর্ত। মহালয়ার পুণ্যলগ্ন। আমরা একসঙ্গে মহালয়া শুনব।

আরোহীর মুখের রং পালটে যেতে লাগল। মাথায় চিন্তার ঝড় উঠেছে। সারারাত এখানে ছিল মানে? ওকে কি তাহলে শাশ্বত কিডন্যাপ করে নিয়ে এসেছে? সকালে লালবাজার যাওয়ার সময় আরোহী ওকে ফোনে বলেছিল, ক্যানিবালিজমের ইতিহাসের ব্যাপারে ওর থেকে কিছু জানতে চায়। দুপুরে শাশ্বত যখন ফোন করে বলল, গুরুত্বপূর্ণ কিছু নথি দেখাতে চায় তখন আর কিছু না ভেবে উত্তেজিত হয়ে নেমে এসেছিল আরোহী। শাশ্বতর পাঠানো ঠিকানায় চলে এসেছিল একা একা। এখন মনে হচ্ছে, কী বোকামি করেছে! একবার অভিদাকে জানাতে পারত! ঈশানকে নিয়ে আসতে পারত। না না! ঈশানের তাহলে বিপদ বাড়ত। বাসবীও জানে না নিশ্চয়ই। কাল থেকে ও বাড়ির বাইরে! পরিবারের কথা ভেবে চোখ ফেটে জল এল ওর। কিন্তু শাশ্বতর সামনে

তো ও দুর্বল হবে না। ও কী চায় আগে বোঝা দরকার। মনে পড়ল, প্রথমদিন সেমিনারে অভিদা বলেছিল, যে কোনো পরিস্থিতিতে ক্রিমিনালের উপস্থিতিতে আমার কী হবে না ভেবে ক্রিমিনালের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ কী বলছে সেটা অবজার্ভ করা জরুরি। তাহলে অনেক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়, যা ভয় কাটিয়ে কনফিডেন্স দেয়। আরোহী চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ মন্দাক্রান্তাম্যামের শেখানো ডিপ ব্রিদিং করে মনকে শান্ত করল। শাশ্বতর চোখে চোখ রেখে বলল, — তোমার কাছে রেডিয়ো আছে?

— না তো!

— তাহলে মহালয়া শুনব কী করে?

— ওহ্ তাই তো! আচ্ছা আমি বরং তোমায় কবিতা শোনাই হ্যাঁ? বাসবীকে যেমন শোনাতাম..

শাশ্বতর চোখমুখ ভালো ঠেকছে না। ওর মাথায় কী চলছে বোঝা দরকার। বুদ্ধি করে আরোহী ওকে চয়েস দিল,

— কী কবিতা শোনাবে?

— পূর্ণেন্দু পত্রী শোনাই হ্যাঁ? 'কথোপকথন' হোক...

আরোহীর মুখ নিরীক্ষণ করতে করতে বলল, — "প্রাণ ছাড়া বাকি সব প্রাণের আরাম"

আরোহী বোঝার চেষ্টা করল, কী বলতে চাইছে শাশ্বত? ওকে এখানে নিয়ে এসেছে কেন? ফোনটাও নিয়ে নিয়েছে। কী চায়? শাশ্বত ওর দিকে এগিয়ে এসে বলতে থাকল,

— "তুমি মৃত হতে হতে
তুমি ধ্বংস হতে হতে
তুমি মমি হতে হতে" হাহাহাহাহ্

শাশ্বতর হাসি আর শীতল চোখের দিকে আর তাকাতে পারে না আরোহী,

— কী বলছ এসব? আমি মমি হব!

— "মমির কথায় রাগ হলো?
মমির প্রসঙ্গ তবে থাক।
জীবনের আলোচনা হোক।"

শাশ্বত-র থেকে চোখ সরিয়ে এবার আরোহীর চোখ পড়ল ওর পেছনে থাকা বড়ো ফ্রিজের দিকে। ওটার ভেতরে কী আছে? একা থাকতে এত বড়ো ফ্রিজের কী দরকার? হঠাৎ ওর গায়ে যেন কারেন্ট শক লাগল। এই ওদের কেসের কিলার না তো? ফেটিশ রাজন ব্যাপারী তো মেয়েদের পা-গুলো এরকম ফ্রিজেই রাখত। শাশ্বত কি তাহলে ওকেই নেক্সট টার্গেট করেছে? ভাবতে ভাবতে ভয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছে আরোহী। ইশ!

আগে বুঝতে পারেনি কেন ও। এর সঙ্গেই আবার কেস নিয়ে আলোচনা করেছে! কী গাধা কী গাধা! এখন কী করবে? গলা শুকিয়ে কেমন কাঠ হয়ে যাচ্ছে। না না, মরে গেলেও কারণটা জানতে হবে ওকে। সময় দরকার। ক্লান্ত লাগলেও ও শাশ্বতকে বলল,

— বাহ্ কী ভালো আবৃত্তি করো তুমি! বাসবী ঠিকই বলেছিল। আমাকে একটু জল দেবে? খিদেও পেয়েছে খুব। খেতে খেতে তোমার আবৃত্তি শুনি?

এটুকু গুছিয়ে বসে দম নিল। ওর শরীর জুড়ে ক্লান্তি এখন। মনে হচ্ছে, ঈশানের হাত ধরে একছুটে শিলিগুড়িতে চলে যায় মা-র কাছে। শাশ্বত বলল,

— আরে নিশ্চয়ই। তুমি আমার বাড়ির অতিথি বলে কথা! দাঁড়াও জল নিয়ে আসি।

শাশ্বত পাশের ঘরে চলে গেলে এই ঘরটা ভালো করে দেখল আরোহী। দরজা দিয়ে ঢুকেই দেয়াল জুড়ে বিশাল ফ্রিজ। উলটোদিকে জানালা। জানালার সামনে খুব সুন্দর একটা ফুলদানি রাখা। ওর মনে পড়ল, বাসবী বলেছিল শাশ্বত মোম গলিয়ে সুন্দর সুন্দর জিনিস বানায়। ফুলদানিটা সেরকমভাবেই বানানো বোধহয়। ও উঠে জানালার কাছে যাবে এমন সময় শাশ্বত তিনটে ধূপকাঠি জ্বেলে নিয়ে ঘরে ঢুকল,

— আরে বসো বসো! উঠছ কেন? একদম উঠবে না। আমি তোমার জন্য রান্না চাপিয়েছি। জল নিয়ে আসছি বসো।

— এখন ধূপ জ্বাললে?

— হ্যাঁ, সকাল হয়েছে তো! আর দেবী এসেছে ঘরে!

শাশ্বত ওকে দেবী কেন বলল? আচ্ছা ওই যদি কর্ণ হয়, তাহলে তো ওর মাদার-ফিগারের সঙ্গে সমস্যা থাকবে! আরোহী কি বাজিয়ে দেখবে একবার? রিস্ক হয়ে যাবে? নো রিস্ক, নো গেইন! একটু দেখাই যাক! কিন্তু কী বলবে? আগে বুঝতে হবে ও-ই কর্ণ কিনা উফ অভিদা, তুমি কোথায়?

এসব ভাবতে ভাবতেই শাশ্বত গ্লাসে জল আর বাটিতে আইসক্রিম এনে আরোহীর সামনের টেবিলে রাখল। তারপর পূর্ণেন্দু পত্রীর 'কথোপকথন' আশ্রয় করে আবার বলে চলল, — "এবার আমি তোমার ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারি"

— বলো।

— "খুব সুখী হবে জীবনে
শ্বেতপাথরে পা
সোনার পালঙ্কে গা
এগোতে সাতমহল
পিছোতে সাতমহল
ঝর্ণার জলে স্নান

তুমি বলবে, সাজব
বাগানে মালিনীরা গাঁথবে মালা
ঘরে দাসীরা বাটবে চন্দন
তুমি বলবে, ঘুমব
অমনি জ্যোৎস্নার ভিতরে এক লক্ষ নর্তকী
সুখের নাগরদোলায় এইভাবে অনেকদিন"

— তারপর?

— রান্না হল কি না দেখি, হলে নিয়ে এসে বাকিটা বলছি।

শাশ্বত রান্নাঘরের দিকে এগোলে, আরোহী তাড়াতাড়ি উঠে জানালার কাছে গিয়ে পর্দা সরিয়ে দেখে নীচে কয়েকজন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দু-একজনের মুখ ওর চেনা মনে হল। ওরা কি ফর্মাল ড্রেসে পুলিশ? থানায় দেখেছে বলেই তো মনে হল। ও জানালার বাইরে দিয়ে হাত নাড়ল একবার। কিন্তু পায়ের শব্দ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে চেয়ারে এসে আগের মতো বসে গেল। বুঝতেও পারল না ওরা খেয়াল করেছে কিনা! প্লেট নিয়ে ঘরে ঢুকে আরোহীর চোখে চোখ রেখে মিষ্টি করে হাসল শাশ্বত। সামনে বসে প্লেটটা এগিয়ে দিয়ে বলল,

— অনলি ফর ইউ আরোহী।

প্লেটের দিকে তাকিয়ে, ছিটকে গেল আরোহী। লাফিয়ে উঠে বলল,

— এ কী! এটা তো হার্ট! মানুষের হার্ট! (চোখ বন্ধ করে ফুঁপিয়ে উঠল)

— শশশ্ চুপ করো সোনা। কেঁদো না প্লিজ লক্ষ্মীটি। তোমার জন্য হৃদয় নিংড়ে রান্না করেছি দ্যাখো। এটা বেক্ড হার্ট উইদ প্লাজমা সস! লিভারের কুচি দিয়ে গার্নিশ করেছি। ভালো লাগছে না? দ্যাখো দ্যাখো, ভালো লাগছে না?

— তুমি এসব কী বলছ! কেন বলছ এরকম? প্লিজ বলো, আমি স্বপ্ন দেখছি! এসব দুঃস্বপ্ন, বলো!

— না না! দুঃস্বপ্ন কেন হবে? তুমি আছ আমি আছি তাই, রক্তে-মাংসে তোমারে যে পাই... ওহহ সরি সরি! রক্ত তো আমি আগেই খেয়ে নিয়েছিলাম। মাংসগুলো প্রসেস করে ফ্রিজে রাখা ছিল। কী করব বলো, মাংস ভালো লাগে না খেতে। আরে তুমি খাচ্ছ না কেন! খাও খাও, নাও!

এতক্ষণে আরোহী নিশ্চিত হল শাশ্বতই কর্ণ! নিজেকে যতটা সম্ভব গুছিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করল,

— তুমি ক্যানিবাল?

— অ্যাই চুপ! একদম চুপ, চুপ! আমি ক্যানিবাল! কেন? একটু রক্ত খাই, তাজা রক্ত খাই বলে আমি ক্যানিবাল? এরম বলতে পারলে তুমি! ছিঃ! তাহলে কালী! হ্যাঁ?

কা-কালী ঠাকুর যে কত রক্ত খায়! ও ক্যানিবাল? ঠাকুর ক্যানিবাল? চুপ করে আছ কেন? এখন বলো?

আকস্মিকতা কাটিয়ে এখন ধাতস্থ হচ্ছে আরোহী। অপ্রস্তুত অভিজ্ঞতার পর মানুষ যেমন পরিণত হয়ে ওঠে সেরকম। শক্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল,

— তুমি মানুষের রক্ত খাও?

— হাঁ, খেতে হয়তো। নরকের অসুরেরা আমার শরীরের সব রক্ত পাউডার করে দেয় জানো! আমি কী করব বলো? আমাকে তো বাঁচতে হবে। রক্ত ছাড়া বাঁচা যায় বলো! তাই আমি রক্ত খাই।

বুঝতে পারল শাশ্বত মানে কর্ণ চৌধুরী ডিজইলুউশনের শিকার! দম নিয়ে জিজ্ঞেস করল,

— কেন এরকম করো শাশ্বত?

— শশশ্ চুপ! শাশ্বত না আমি। আমি এখন কর্ণ। হ্যাঁ, কর্ণকুন্তল চৌধুরী। শাশ্বত তো ভালো ছেলে, শান্ত ছেলে, ভদ্রলোক। কলেজে যায়, কবিতা পড়ে, প্রেম করে। আমি শাশ্বত না। আমি কর্ণ। জানো, আগে কত রক্ত ছিল শহরে! ছাগলের রক্ত, গোরুর রক্ত। মুরগির রক্ত, সে তো জলের মতোই খাই। কিন্তু এখন আর এসব খেলে হবে না। আমাকে অসুররা বলেছে, এখন খেতে হবে মানুষের রক্ত! মেয়েমানুষের রক্ত, তাজা রক্ত খেতে হবে! নয়তো আমি তো করোনায় মরে যাব বলো!

— কী?

— হাঁ গো, সত্যি বলছি। মাতৃকা, বুঝলে! সপ্তমাতৃকার রক্ত খেতে হবে। নয়তো করোনা হবে আর আমি পট করে মরে যাব। এজন্যই তো একটা করে দেবী নিয়ে আসি আর মাথাটা কেটে রক্ত খাই। সুস্থ থাকি বেশ। সাতদিন ধরে রক্ত খাই, হাড় থেকে মাংস আলাদা করি, প্রসেস করি। কী নরম মাংস! কিন্তু আমি খাই না। তুমি তো বাসবীর বোন! খুব ভালো মেয়ে তুমি। তাই আজকে তোমার জন্য হৃৎপিণ্ডটা রেঁধে দিলাম তুমি খাও, তারপর একটু রেস্ট নিয়ে নাও। একটু রাত হলেই আমি তোমার রক্ত খাব। তোমার রক্ত আমার রক্তে মিশে গেলে আর কেউ আটকাতে পারবে না। অ্যান্টিবডি তৈরি হয়ে যাবে রক্তে আর করোনা কিচ্ছু করতে পারবে না আমার।

মৃত্যুভয় গ্রাস করতে শুরু করে আরোহীকে। ভয়ে বলতে থাকে,

— শা...শাশ্বত!

— কী, কর্ণকে ভালো লাগছে না? শাশ্বতকে মিস করছ? ঠিক আছে, শাশ্বতর মতো কবিতা বলি তোমায়!

শাশ্বত যেখানে থেমেছিল, সেখান থেকে আবার শুরু করল কর্ণ—

— "রক্তের রাঙা মাটির পথে সুড়ঙ্গ কেটে কেটে
একটা সাপ

নদীর বুকে ঝুঁকে-পড়া লাল গোধুলি তার চোখ
দাঁতে মুক্তোর দানার মতো বিষ,
যেন বটের শিকড়
মাটিকে ভেদ করে যার আলিঙ্গন।
ধীরে ধীরে তোমার সমস্ত সোনার গয়নায় শ্যাওলা
ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টিতে, ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টিতে সাদা।"

২৬

এলোপাতাড়ি ভাবতে ভাবতে রাত ভোর করে দিল অভিদা। চারটের অ্যালার্ম বাজতেই ধড়ফড় করে উঠে বসল। মনে পড়ল, গুজরাট কেন আমেরিকায় থাকতেও নেট থেকে ডাউনলোড করে মহালয়া শুনত প্রতিবছর। ঈশানও উঠে বসেছে অ্যালার্মের শব্দে। রেডিয়ো চালিয়ে দিয়ে হাতমুখ ধুয়ে নিল ওরা। নীচে নেমে ঈশান টিভিটা চালিয়ে দিল। ওর মনে আছে, মা রেডিয়োয় মহালয়া শোনার পর পাঁচটা বাজলেই টিভিতে বাংলা সিরিয়ালের চ্যানেলে মহালয়া দেখত। অভিদা চা করে নিয়ে এসে দেখল, টিভিতে চলতে থাকা চ্যানেলে এক-একজন এক-একরকম দেবী সেজেছে। এক-এক দেবীর এক-একরকম কাজ। ব্রহ্মাণী, ব্রহ্মার স্ত্রী মানে সরস্বতী, মহেশ্বরের স্ত্রী মাহেশ্বরী শক্তিময়ী, কুমার কার্তিকের স্ত্রী কৌমারী যুদ্ধবিদ্যায় নিপুণ, বিষ্ণুর স্ত্রী বৈষ্ণবী জগৎ পালন করেন। দেখতে দেখতে অভিজ্ঞান ছিটকে উঠে দৌড়ে স্টাডির দিকে যায়। ঈশানও তাড়াতাড়ি ছুটে যায় অভিদার পেছন পেছন।

চেয়ার ধরে দাঁড়িয়ে অভিদা বোর্ডের ছকটা মন দিয়ে দেখতে থাকে। তারপর ফোন হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ খুটখুট করে, মার্কার নিয়ে এগিয়ে গিয়ে, ছকের পাশে আর-একটা লাইন টেনে লেখে,

	নাম	পেশা	লাস্ট লোকেশন	রূপক
১।	সুরভি সাউ	সেনা	কলকাতা স্টেশন	কৌমারী
২।	তনয়া মজুমদার	পুলিশ	শিয়ালদহ	বরাহী
৩।	শৈলজা মিত্র	সাংসদ	বেহালা	মাহেশ্বরী
৪।	বৈজয়ন্তী বাসু	বুটিকের মালকিন	এসপ্লানেড মেট্রো	বৈষ্ণবী
৫।	বাণীশ্রী গুহ	প্রফেসর	মানিকতলা	ব্রাহ্মণী
৬।	আরোহী দত্ত	ইন্টার্ন, ক্রিমিনাল সাইকোলজি	লালবাজার	কালী

ঈশানের দিকে তাকিয়ে, দম ফেলে বলল, — কাল রাত থেকে পোকার মতো মাথায় ঘুরছে এদেরকেই কেন ভিক্টিম হিসেবে বাছল কর্ণকুন্তল চৌধুরী? এতক্ষণে একটা হাইপোথিসিস দাঁড় করানো গেল।

— মানে?

— মার্কণ্ডেয় পুরাণ মতে, ব্রহ্মাণী অর্থাৎ সরস্বতী থেকে কালী এরা সবাই সৃষ্টি থেকে সংহার পর্যন্ত সপ্তমাতৃকার সাতটা রূপ। তান্ত্রিক ধর্মমতে, এই সাতজন মাতৃকার গুরুত্বই সবচেয়ে বেশি। শাক্তধর্মমতে, এই মাতৃকারা অসুরবধের সময় দুর্গাকে হেল্প করেছিলেন। যে কারণে মহালয়ার দিন অসুরবধ দেখানোর সময় এদের প্রসঙ্গ এনেছে চ্যানেল। ভাগ্যিস এনেছে! নয়তো মোক্ষম সময়ে এই ক্লুটাই পেতাম না!

— কিন্তু এই কেসে পুরাণ! অভিদা, বাসবী বলেছিল কি, শাশ্বতর মাইথোলজিতেও ইন্টারেস্ট ছিল।

— তাহলে তো মিলছেই। দ্যাখ শাশ্বত হোক বা কর্ণ, রেনফিল্ড সিন্ড্রোম থেকে থাকলে ও তো ডিজইলিউশনের পেশেন্ট

শুনতে শুনতে ঈশান বলল, — রেনফিল্ডের মনে হত, পিঁপড়ে বা মাকড়সার রক্ত খেলে ও ওদের শক্তি নিজের মধ্যে আনতে পারবে। তাহলে শাশ্বত কী ওর ভিক্টিমদের মাতৃকা ভেবে ওদের মেরে, নিজে শক্তিমান হবে মনে করছে?

— এগজ্যাক্টলি! অমূলক ফ্যান্টাসির জগৎ থেকে ও এরকম করতে পারে। তুই ভিক্টিমদের পেশাগুলো মাতৃকাদের কাজের সঙ্গে মিলিয়ে দ্যাখ বুঝতে পারবি আমাদের চার্টে প্রথমে আছে কৌমারী। মাতৃকাদের মধ্যে কৌমারী হলেন যুদ্ধবিদ্যায় দক্ষ। মানে আধুনিক পরিপ্রেক্ষিতে সেনানী, আমাদের সুরভি সাউ। তারপর দ্যাখ বরাহী, মাতৃকাদের মধ্যে ওঁ দণ্ডিনী, মানে শাস্তি দিয়ে থাকেন। আজকের দিনে এই কাজ করেন পুলিশ, আমাদের ভিক্টিম তনয়া মজুমদার। মাহেশ্বরী শক্তিময়ী। পাওয়ারফুল পজিশনেই ছিলেন সাংসদ শৈলজা মিত্র। বৈষ্ণবী, মানে যিনি পালন করেন, অর্থাৎ যার আন্ডারে কাজ করে অনেক মানুষ খেয়ে পরে জীবিকা নির্বাহ করে...

এবার ঈশান বুঝে বুঝে বলল, — যেমন ইন্ডাস্ট্রি বা ব্যবসায়ী। বৈজয়ন্তী বাসুর বুটিক হাউসের দৌলতে অনেক মেয়েই ওদের সংসার চালাতে পারত। ব্রাহ্মণী বা সরস্বতী বিদ্যার দেবী হলে প্রফেসর বাণীশ্রী গুহর বিদ্যা নিয়েই কাজ। আরোহী...

বলতে বলতেই ঈশানের চোখমুখ নরম হয়ে গেল। অভিদা এগিয়ে এসে ওকে ধরে বলল, — মাতৃকাদের মধ্যে দেবী কালী হলেন সংহারের প্রতীক। কর্ণ ভালো করেই জানে, আরোহী ওকে ধরার জন্যই কাজ করছে তাই ওকে কালী ভেবেছে। কালী ওর জন্য ভীষণ ভয়ংকর।

— দেবী ভাবলে আবার ভয়ংকর ভাবছে কেন?

— কারণ প্রথম দিকে এই মাতৃকাদের অমঙ্গলকর ও বিপজ্জনক দেবী বলে উল্লেখ করা হত। পরের দিকে পুরাণগুলিতে ওঁদের রক্ষাকর্ত্রীর ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। তবে এই বর্ণনাগুলোতেও ওঁদের কয়েকজন অমঙ্গলকর এবং ভয়ানকই রয়ে যান। এইভাবে দেবীরা প্রকৃতির সৃষ্টিকারিণী এবং ধ্বংসকারিণী দুই রূপেরই প্রতীক হয়ে ওঠেন। বুঝলি?

— সে তো বুঝলাম। কিন্তু অসুরবধ করতে আমাদের তো কর্ণের প্রাসাদে যেতে হবে এখন!

— হ্যাঁ।

ঠিক এই সময় সাদ ফোন করে জানাল,

— স্যার, আরোহীকে ট্রেস করা গেছে। মংলু কর্ণর বাড়ির দেয়াল বেয়ে রান্নাঘরের জানালা দিয়ে ওর ঘরে ঢুকে গেছে। ও নাকি আরোহীকে জানালা দিয়ে ওই ঘরের বাইরে থেকে হাত নাড়তে দেখেছিল। ঘরে গিয়ে সিয়োর হয়ে আমাদের মেসেজ করে জানিয়েছে। আরোহী এখনও পর্যন্ত সুস্থ আছে স্যার।

— সাদ! সাদ আমরা এক্ষুনি স্পটে আসছি।

ফোন রেখে ঈশানকে জড়িয়ে ধরল অভিদা। বুকভরে অক্সিজেন নিয়ে দ্বিগুণ উদ্যমে রওনা দিল আরোহীকে আনতে। অভিদার গাড়িতে উঠে ঈশান বাসবীকে ফোন করে খবরটা জানাল। শাশ্বতর কথা শুনে বাসবী কাঁদতে কাঁদতে বলল, ও এক্ষুনি ওখানে যাবে। গিয়ে দেখবে কাকে ও বন্ধু ভেবেছিল।

২৭

আরোহী কর্ণর কবিতাচ্ছলে হুমকিগুলো হজম করল টেবিলে রাখা জলটা ঢকঢক করে গিলতে গিলতে। তারপর ওর দিকে তাকাতেই দেখল ওর পেছনে রান্নাঘরের ওপাশ থেকে উঁকি মারছে মংলু! উত্তেজিত হতে যাবে তক্ষুনি মংলু ওকে হাতের ঈশারায় দেখাল, — চুউপ!

ঢোক গিলে নিজেকে সংবরণ করে নিল আরোহী। যাক, ওর হাত নাড়ানোটা তাহলে বৃথা যায়নি! কিন্তু কর্ণ যেভাবে সারাঘরে পায়চারি করছে তাতে যে-কোনো সময় মংলুকে দেখে ফেলতে পারে। চোখের সামনে মানুষের হার্ট, লিভার দেখে কেমন ঘেন্না লাগছে ওর। অভিদা কেন বলে, এই ফিল্ডে আসার আগে লজ্জা, ঘেন্না, ভয় তিন বিসর্জন দিয়ে আসতে হয়; তা হাড়ে মজ্জায় বুঝতে পারল এখন। ওর মনে হল, কাল এখানে আসার পর থেকে আজকে সকালের মধ্যে ভেতর ভেতর অনেকটা পালটে গেছে ও। এই বদলটা অনেক কিছু শিখিয়ে দিল ওকে। মংলুর দিকে ভরসার চোখে তাকিয়ে কর্ণকে বলল,

— কর্ণ বোসো। বসে কথা বলি।

— হ্যাঁ বসি। খাচ্ছ না কেন? খাও..

— তোমার মা কে কর্ণ? কুন্তী?

কর্ণ আরোহীর দিকে ঘোলা চোখে তাকিয়ে থেকে বলল,

— মা! আমার মা? তুমি দেখবে আমার মাকে? হ্যাঁ! দেখবে? আমার মায়ের জানো মাথাটা একপাশ দিয়ে থেঁতলে গেছিল! কীভাবে থেঁতলে গেছিল জানো? ইট দিয়ে! দেখাচ্ছি দাঁড়াও,

অস্বাভাবিকভাবে টলোমলো পায়ে হেঁটে হেঁটে ও পাশের ঘর থেকে আধলা ইট হাতে বেরিয়ে এল। আরোহীর সামনে এসে বলল, — এবার কালী আমি তোমায় খাব। আমাকে ধ্বংস করার খুব শখ না তোমার? চিবিয়ে তোমার মুণ্ডুখানা তবে আমি শান্ত হব। ভেবেছিলাম আর সবার মতো আগে তোমার রক্ত খাব। কিন্তু তোমার মাথাটা যে খুব চিন্তা করে! এত চিন্তা করলে তো আবার আমার সমস্যা! তাই আগে এই মাথাটা থেঁতলে দিই অ্যাঁ! মায়ের মতো তোমার মাথাটাও থেঁতলে দিই...

অবাক আরোহীর মাথা চেপে ধরে কর্ণ ওর হাতের ইটটা কায়দা করে মারতে যাচ্ছিল, কিন্তু চোখের পলকে ওকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল মংলু। কিন্তু নিজে সরে যাওয়ার আগেই কর্ণর হাত থেকে ইটটা বেকায়দায় ছিটকে এসে মংলুর মাথায় লাগল। নিমেষের মধ্যে দরজা দিয়ে ঢুকে এল ফর্মাল পোশাক পরা পুলিশফোর্স। মংলুকে তাড়াতাড়ি পুলিশের গাড়িতে তুলে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। আরোহী অনেক কষ্টে নিজের নার্ভ ধরে রাখার চেষ্টা করলেও আর পারল না। কাল দুপুরের পর থেকে না-খাওয়া ক্লান্ত শরীরে, কর্ণর দেওয়া ড্রাগের প্রভাবে ও মাথা ঘুরে পড়ে গেল। কর্ণ আরোহীর দিকে এগোতে গেলে পুলিশরা ওকে ঘিরে ফেলে। কর্ণ বুঝতে পারে, ওর আর কিছু করার নেই। অবসন্ন দেহে চেয়ারে এলিয়ে বসে পড়ে। দরজা দিয়ে বাসবীকে ঢুকতে দেখে বলে,

— এ কী! তুমি টিপ পরোনি? কেন?

বাসবী রাগে, ঘৃণায় ওর থেকে চোখ সরিয়ে নেয়। আরুকে মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখে সেদিকে ছুটে যায়। ইতোমধ্যে ঈশানকে নিয়ে অভিদা পৌঁছে যায় কর্ণর ঘরে। ঈশান দৌড়ে গিয়ে, গ্লাভস পরে, আরোহীর হাত টেনে নাড়ি দেখে অভিদার দিকে তাকিয়ে নিশ্চিন্ত হাসি দেয়।

এখন আরোহীর চেয়ারে বসে আছে অভিজ্ঞান আর ওর মুখোমুখি চেয়ারে কর্ণ ওরফে শাশ্বত চৌধুরী। অভিজ্ঞান কবচ-কুণ্ডলহীন কর্ণকে জিজ্ঞেস করল,

— মাকে কীভাবে হারিয়েছিলে কর্ণ?

কর্ণ অভিজ্ঞানের দিকে তাকাল না। ঘোলাটে চোখে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করতে থাকল, — মা ইটভাটায় কাজ করত। আমার তখন দশ বছর বয়স। চোখের

সামনে মাকে রেপ করে মাথাটা থেঁতলে দেওয়া হয়। সেদিন রাতে এই শহরে আমার একটাও রুটি জোটেনি। গভীর রাতে আমার পাশে রাস্তার একটা নেড়ি কুকুর ছাড়া কেউ ছিল না। ইট দিয়ে ওই কুকুরের মাথাটা থেঁতলে দিয়ে রক্ত খেয়েছিলাম। ভালো লেগেছিল।

অভিজ্ঞান বুঝল, ওর সাইকোপ্যাথে হাতেখড়ি সেদিন হয়। তারপর রক্তপিপাসু হয়ে যায়। ওর আর—এক সত্তার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করল,

— তাহলে শাশ্বত? ওর কবিতা? বর্ধমানে বাড়ি?

— বর্ধমানে কাদু থাকে। কেদার চোধুরী। শিয়ালদা স্টেশনে খোঁজখবর নেবেন। জানতে পারবেন।

— বেশ! সুরভির সঙ্গে কীভাবে আলাপ?

হাতের কর গুনে গুনে কর্ণ বলল, — সুরভির সঙ্গে ফেসবুকে মিউচুয়াল ফ্রেন্ডের মাধ্যমে। তনয়াকে ফার্স্ট দেখি পার্কস্ট্রিটে। শৈলজা ম্যাডাম নিজে ইমোশোনালি ডিপেন্ড করতেন আমার ওপর। ভেতর ভেতর একা ছিলেন মহিলা। ওকে কাউন্সেলিং করাতাম নিজের মতো করে। ছবি আঁকতে বলেছিলাম। রং-তুলি নিয়ে দিব্য ভালো ছিলেন। বৈজয়ন্তী বাসুর সঙ্গে ওর বুটিকেই আলাপ। ভদ্রমহিলারও সেম কেস। একা! বাণীম্যামকে আমি শ্রদ্ধা করি। ওর রক্তপান করে আমি শুদ্ধ হয়েছি। লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট আরোহী। ওর চোখেমুখে একটা স্পার্ক আছে দেখবেন। সব কিছুর শেষ পর্যন্ত দেখে নেওয়ার একটা জেদ আছে। ওইতো আমার কালী! ঠিক ধরে ফেলল অ্যাঁ! আমার আর শাশ্বত সত্য হওয়া হল না!

— সবাই তোমার বাড়িতে চলে আসত কীসের টানে?

— কেউ মায়ার টানে, তো কেউ সূত্রের, তো কেউ সম্পর্কের। সুরভি এসেছিল উপহার নিয়ে, তনয়া বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে, শৈলজা ম্যাডাম দলের গোপন ষড়যন্ত্রকারী কে সেটা জানতে, আমার সঙ্গ চাইতে, বৈজয়ন্তী বাসু বুটিকের নকশার জন্য পৌরাণিক উল্কির ব্যাপারে জানতে, বাণীম্যাম লাউয়ের পায়েস নিয়ে এসেছিলেন আমার জন্য। আর আরোহীকে আমি আসতে বলেছিলাম ক্যানিবালিজমের নথি দেখাব বলে।

— বাহ্ আর কলেজে কলেজে হুটহাট ঝামেলা লাগানোটা?

— ইউনিয়নকে হাতে রেখে ওরকম একটু-আধটু করতে হয়। তাতে রিস্ক—ফ্রি হয়ে কাজ করা যায়। যাই হোক, আপনার আর কী প্রশ্ন আছে করে তাড়াতাড়ি ছাড়ুন। গিয়ে ঝুলে পড়ি।

— কেন? তুমি ক্লান্ত?

— হ্যাঁ খুব! আর ভালো লাগছে না। এবার ঝুলে পড়ি। জীবন শেষ হোক।

— তুমি জানো তুমি অসুস্থ?

— আমার মতো শৈশব কাটিয়ে 'সভ্য' সমাজে সুস্থভাবে ঘুরে বেড়ালে আপনি অসুস্থ!

— কী করেছ ওদের সঙ্গে?

— আরোহী সব জানে। ওকে জিজ্ঞেস করবেন। আর আমি বেরিয়ে গেলে ফ্রিজটা চেক করে নেবেন। আপনার মাথায় বুদ্ধি আছে, বুঝতে অসুবিধা হবে না।

— জীবনটা বিস্বাদ করে দিলে কেন শাশ্বত?

— জীবনটা তো হরলিক্স না যে চেটে চেটে খাব। জীবন তো একটা জ্বলন্ত সিগারেট। জ্বলে পুড়ে হয়ে গেছে ছাই। এবার আমি যাই।

অভিজ্ঞান বুঝল, কর্ণ ফ্যান্টাসিতে আছে। ম্যানিক ডিপ্রেশন থেকে বাইপোলার পার্সোনালিটি হয়ে গেছে ছেলেটার। কিন্তু অভিজ্ঞান এখনও বুঝতে পারছে না, ও ফেটিশ কিনা! ফেটিশ হলে সাধারণত ভিক্টিমের পা বা অন্য কোনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ওর সংরক্ষণ করে রাখার কথা। ফ্রিজ খুললে অবশ্য বোঝা যাবে। কিন্তু বিস্ময়ের তখনও কিছু বাকি ছিল। কর্ণ উঠে পুলিশের সঙ্গে বেরোতে গিয়ে ফিরে এল। জানালার সামনে রাখা সুন্দর ফুলদানিটা নিয়ে অভিজ্ঞানের হাতে দিয়ে বলল,

— কেস ডিসকাস করার সময় আরোহী বলছিল, আপনারা কনফিউজড আমি ফেটিশ কিনা! আমি ফেটিশের ব্যাপারে একটু পড়াশোনা করে দেখলাম, হলেও হতে পারি। কারণ মাতৃদেহের...হ্যাঁ স্যার, আমার কাছে নারী মাত্রেই মাতৃকা। মাতৃদেহের যে অংশ আমাদের পরিপুষ্ট করে, সেই স্তনবৃন্তকে আমি সযত্নে কেটে তুলে রেখেছি। বাসবী জানে, আমি মোম গলিয়ে সুন্দর সুন্দর জিনিস বানাতে পারি। পঞ্চমাতৃকার স্তনবৃন্ত গলন্ত মোমের আবরণে আবৃত করে আমি এই ফুলদানি সাজিয়েছি। এটা যত্নে রাখবেন।

থরথর করে কাঁপতে থাকা হাতে ফুলদানিটি ধরে রেখে অভিজ্ঞান কর্ণর চলে যাওয়া দেখল। ধাতস্থ হয়ে উঠে বসে হাতে গ্লাভস পরে ফ্রিজ খুলতেই হড়হড় করে মেঝেতে বমি করে ফেলল।

২৮

এখন সকাল দশটা বাজে। নিজের ঘরের বিছানায় শুয়ে আস্তে আস্তে চোখ মেলে তাকায় আরোহী। বাসবী ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বলল,

— কীরে, একটু বেটার এখন?

— হ্যাঁ, উঠব একটু।

জলের গ্লাস এগিয়ে দিয়ে ঈশান বলে,

— হ্যাঁ, ওঠ। নে, জল খা।

গ্লাসটা নিয়ে আরোহী জিজ্ঞেস করল,

— তুই এখানে! মংলু কোথায়? ওর মাথায় ইট লেগেছিল মনে আছে আমার। তার পরেই সব ঝাপসা হয়ে গেছিল।

— হুম্। আসলে তোকে জলের মধ্যে 'রেপ ড্রাগ' রোহিপনল্ মিশিয়ে দিয়েছিল কর্ণকুন্তল চোধুরী। তাই সেন্সলেস হয়ে গেছিলি। তারপর বাসবী আর আমি তোকে নিয়ে চলে আসি এখানে। ফর্মাল কাজ সব মিটিয়ে অভিদাও এখানে আসছেন।

— আচ্ছা!

— তুই ভালো আছিস শুনে মা পুজো দিতে গেছে। বাবা তর্পণ সেরে মাকে নিয়ে ফিরছে।

— জেম্মাকে বল আমি একদম ফিট অ্যান্ড ফাইন! আচ্ছা ঈশান, ওর নাম কর্ণ চৌধুরী না? কর্ণকুন্তল চৌধুরী?

— হ্যাঁ। তনয়ার বন্ধুর থেকে এই নাম জানা গেছিল।

— ওহ্!

এমন সময় দরজায় কলিং বেল বেজে উঠতে ঈশান বলল,

— অভিদা এল মনে হয়। আমি খুলছি।

ঈশান উঠে গেলে বাসবী আরোহীকে বলল,

— ঈশানের চোখমুখ দেখেছিস? পাগল হয়ে গেছিল তোকে না পেয়ে। ভোরে তুই সুস্থ আছিস জেনে বাচ্চাদের মতো ছটফট করছে। ওকে অ্যাকসেপ্ট করে ফ্যাল বনু। হি রিয়েলি লাভস ইউ!

আরোহী লাজুক হেসে দরজার দিকে তাকাতেই দেখে অভিদাকে নিয়ে ঈশান ঢুকে এল। অভিদা চেয়ারে বসে জিজ্ঞেস করল,

— কেমন আছিস চ্যাম্প?

— ফিট অ্যান্ড ফাইন! তুমি ব্ল্যাক কফি খাবে তো? আমি করে নিয়ে আসছি!

— খবরদার না! আমি এখন কেস ডিসকাস করব আর তোরা শুনবি। কেউ কোথাও যাবি না।

— আচ্ছা বলো... স্বীকার করল সব ?

— স্বীকার! ও প্রাউড ফিল করছিল যে, ছয়জন নারীর একজনকেও ও রেপ করেনি, ও রেপিস্ট না। মানুষ বাঁচার তাগিদে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি অনেক কিছু করে। ও শুধু পাঁচজনের রক্তটুকু খেয়েছে, আর কিছু না। হ্যাঁ, লাস্টটাইম ফেলিওর হল বলে বেশ রাগ হয়েছে ওর।

বাসবী টলটলে চোখে জিজ্ঞেস করল, — তাহলে শাশ্বত? ওর কবিতা? বর্ধমানের বাড়ি?

— ওর দেওয়া তথ্য ক্রস চেক করে জানা গেছে, বর্ধমানে কেদার চৌধুরী থাকত। পড়াশোনায় তুখোড়। হায়ার স্টাডিজের জন্য কলকাতায় আসে। তোমার সঙ্গে আলাপ হয়, কবিতা হয়, প্রেম শুরু হয়। সব ঠিক ছিল। কলেজ থেকে মানিকতলার ফ্ল্যাটে ফিরে, কেদার চৌধুরী মুরগি, ছাগল, গোরুর রক্ত খেয়ে ঘুমাতে যেত। সকালে ঘুম থেকে উঠে, শাশ্বত কলেজে আসত। ক্ষুধার সঙ্গে খাদ্যের কোনো সংঘর্ষ ছিল না ততদিন। তারপর বাধ সাধল কোভিড। রেনফিল্ডস্ সিনড্রোম ছিল তো, ডিলিউশনে অসুরদের সঙ্গে কথা বলত। ওর মনে হত, অসুররা ওর শরীরের রক্ত সব পাউডার করে দেয়। তাই রক্ত তরল রাখতে হলে ওকে রক্ত খেতে হবে। কোভিডের সময় এত রক্ত পাবে কোথায়! আর কলেজে রোজ তোমরা ওর সঙ্গে থাকতে। কিন্তু লকডাউনে ও তো আরও বেশি একা হয়ে পড়ে। তখন ওর অসুররা ওকে বলে, মাতৃকার রক্ত খাও। আসলে নারীর রক্ত পান করার পর ওর মনে হত, ওর সঙ্গে ওই দেহটা আছে। ও আর একা নেই। ওর ফ্রিজ খুলে দেখলাম, ওই পাঁচজনের থেঁতলে দেওয়া মাথা পরপর সাজিয়ে রাখা ছিল। টোকেন নাম্বার দিয়ে এক থেকে পাঁচ অবধি, যারা পরপর উধাও হয়ে গেছিল।

আরোহী বিড়বিড় করে বলল,

— ছয় নম্বর মাথাটা আমার হত!

— হয়নি তো! তুই তো কত সাহস নিয়ে চোখের সামনে রান্না করা মানুষের হার্ট দেখেছিস! ওকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে গেছিস!

— এখন বুঝতে পারছি, ঘরে তখন তিনখানা ধূপকাঠি কেন জ্বেলেছিল! ওসব রান্না করার সময় আমি যেন গন্ধ না পাই তাই ওরকম করেছে।

— হ্যাঁ। তোকে কাল আইসক্রিমের মধ্যে রোহিপনল মিশিয়ে খাইয়ে অজ্ঞান করে রেখেছিল।

— এজন্য সাড়ে তিনটেয় আমার জ্ঞান ফেরে!

ঈশান বলল,

— ব্রাহ্মমুহূর্তে কর্ণ কালীর সংহার করবে বলে!

— ভাগ্যিস মংলু ততক্ষণে পৌঁছে গেছিল! ও কেমন আছে গো? মাথায় চোট পেয়েছিল।

— হ্যাঁ ওকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। ট্রিটমেন্ট চলছে। সিটিস্ক্যান রিপোর্ট বলছে, আগে থেকেই মাথার কিছু অংশে সিস্ট ছিল। তবে এই চোটটা অত গুরুতর নয়। ঠিক হয়ে যাবে।

— আমায় বাঁচাতে গিয়ে ওর এরকম হল!

ঈশান বলল,

— মংলুকে আর খ্যাঁচা বলব না। সরি বলে আসব। ভালো হয়ে যাক।

অভিদা ইচ্ছে করেই কর্ণর ফেটিশ কেসটা তুলে ফুলদানির কথাটা এখন বলল না। বাসবী বাইরে থেকে শক্ত হয়ে থাকলেও ও এটা নিতে পারবে না। অভিদা বলল,

— আমার কয়েকটা ফোনকল আছে। সেরে নিই? তারপর তোর জেঠুর সঙ্গে দেখা করে বেরিয়ে যাব।

ওদের একা ছেড়ে দিয়ে অভিদা সামনের ঘরে গিয়ে ফোন করল সুদূর আমেরিকায়।

আরোহী বাসবীর হাত ধরে জিজ্ঞেস করল, — মিস করবি?

— হুম্‌ম, হ্যাঁ। শাশ্বতকে মিস করব, শাশ্বতর কবিতাকে মিস করব। ব্যস ওই অবধি। আর কিছু না। জানালাগুলো খুলে দিই, আলো আসুক।

বাসবী জানালা খুলে দিয়ে পর্দা টেনে দিলে ঘরে আলোছায়া খেলতে লাগল। ও আরোহী, ঈশানকে একা ছেড়ে দিয়ে চা করতে চলে গেলে আরোহী ঈশানের হাত ধরে বলে,

— আমি ঠিক আছি। সত্যি। তুই আর ভয় পাস না।

— সত্যি?

— হ্যাঁ রে!

তারপর ওকে জড়িয়ে ধরে বলে, — আমরা একসঙ্গে থেকে যাব। আর তুই বেশি বদমায়েশি করলে আমি কিন্তু সত্যি সত্যি কালী হয়ে খাঁড়া ছুড়ে মারব।

ঈশান আরোহীকে আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বলল, — হ্যাঁ মা নেত্যকালী, আপনি আমার ঘাড়ে উঠে নেত্য করবেন। আমি মিউজিক চালিয়ে দেব। নো প্রবলেম!

শহর থেকে হঠাৎ উধাও হতে থাকে তরুণীরা। কোনোরকম খোঁজ পাওয়া যায় না। শিয়ালদহ স্টেশন, বর্ধমান জেলা, মানিকতলা অঞ্চল। সল্টলেকের অফিসে বসে কীসের যোগসূত্র খুঁজছে অভিজ্ঞান?

একটা সাইকোটিক ডিসঅর্ডার, কয়েকজন নারী, একটা গল্প। তুমুল জনপ্রিয় কাফনের ঘ্রাণের মাধ্যমে যে অভিদার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, পাঠকদের জন্য রইল সেই অভিদার প্রথম কেসের সন্ধান।



DEBIRAKTA
A BENGALI THRILLER
BY SHUSMITA SAHA
RS. 250 $ 10
AVAILABLE ON WWW.DOKANDAR.IN

ISBN 9789394551879

